গহকারক ! দিট্ঠোহসি
পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা
গহকূটং বিসংখিতং।
বিসংখারগতং চিত্তং
তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা ॥
দেহঘর নির্ম্মাতারে অন্বেষণ করি,
বার বার করিলাম জনম ধারণ ;
পরিভ্রম করিলাম অসংখ্য সংসার ;
কিন্তু হায় ! তবু তাঁর দেখা মিলিল না .
বিড়ম্বনা পুনঃপুনঃ জনম গ্রহণ !
এবারে চিনেছি তোমা ওগো গৃহকার !
পারিবেনা গৃহ আর করিতে নির্ম্মাণ ;
গৃহভিত্তি নির্ম্মাণের যত উপাদান
ভগ্ন, নষ্ট, বিসংস্কৃত করিয়াছি সব—
বীততৃষ্ণ চিত্ত লীন নির্ব্বাণ-সায়রে।

——

ম্যানচেষ্টার কলেজ এবং মীডভিল থিয়লজিকাল স্কুলের স্কলাশিপ সম্বন্ধে পত্র। *

From

A. C. Banerji, Esq., I. E. S.,
M. A. (Cantab), M. Sc (Cal),
F. R. A. S (London)
Gyan Kutir, Katra,
ALLAHABAD.
Dated 29th October, 1929.

To

The Editor, of
The Tattwa bodhini Patrika

Dear Sir,

Will you kindly publish the following set of questions in your esteemed paper ? I shall be much obliged if any of your readers, acquainted with true facts will kindly send his replies through the medium of your paper. I am sure every Brahmo is interested in this matter, especially as at the present moment there is such a dearth of Brahmo ministers and social workers that any privilege and facility afforded by liberal religious bodies in the West for the training of our men, should be readily availed of.

Youra faithfully,

[QUESTIONS.]

(1) What has become of the Manchester College and the Meadville Theological School Scholarships, Candidates for which used to be selected by the Brahmo Samaj Committee ?

(2) Has any body been selected to receive the Scholarship since 1925 ? If not, why ?

(3) Notices of the offer of the Meadville Scholarship appeared for the last time in Brahmo Samaj papers during the latter half of 1926. Why was no one selected that year ? Why did not the notice reappear in the years following, if no candidate was seleeted in 1825 ?

(4) When was the last meeting of the Brahmo Samaj Committee held ? Were members representing all the three Samajes present on the occasion ? Were notices served on them in time so that they could attend the meeting ?

(5) Several Ttustees of the Meadville Theological School (including the President-Emeritus Dr. F. C. Southworth) visited India since 1926, Did the Brahmo Samaj Committee meet them and discuss the prospects of such scholarships ? If so, what was the result ? If not, who is responsible for not arranging any conference between the Meadville Trustees and the Brahmo Samaj Committee ?

(6) The Brahmo Samaj Committee among others had for its aim the bringing about of a friendly relation among the

* আমরা উপরোক্ত বিষয়ে শ্রীযুক্ত এস, সি, ব্যানার্জ্জী মহোদয়ের সার্কুলার পত্রখানি সাদরে প্রকাশ করিলাম। আগামী সংখ্যায় ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিব এবং তৎপরে এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। তঃ সঃ সম্পাদক।

different Samajes. Was anything done by the Committee to make a united celebration of the Centenary possible? If nothing was done, why was it not done?

——

ছাত্রজীবন।

(শ্রীরত্নমালা দেবী)

দিনে দিনে মাস পূর্ণ হইয়া থাকে। মাস হইতেই আবার বৎসর পূর্ণ হয়। বৎসর আবার যুগে পরিণত হইয়া থাকে। এই যুগব্যাপী অনন্ত কাল লইয়াই আমাদের জীবন।

যদি কেহ এই জীবনকে সুন্দররূপে সাধুভাবে সুগঠিত করিয়া তুলিতে চাহেন, তবে শিশুকাল হইতেই জীবনকে সাধুভাবে গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। শিশুজীবনের প্রথম গঠনই মাতৃহস্তে ন্যস্ত। জননীর মহত্ত্বেই বালক পরিণত বয়সে চরিত্রবান উদার দয়ালু ও ধার্ম্মিক হইয়া থাকে। আমাদের দেশের রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা মনীষিগণ জননীর মহত্ত্বেই মহৎ হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই শিশুদিগের চরিত্র গঠন হওয়া আবশ্যক। শিশু ক্রমে বয়স্ক হইয়া যাহাতে পবিত্র ভাবে ছাত্রজীবন যাপন ও কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষক ও পিতা-মাতার একান্ত লক্ষ্য রাখা উচিত। শুধু বিদ্যাশিক্ষায় বালকগণের চরিত্রগঠন হইতে পারে না। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য, যাহাতে তাহারা ছাত্রজীবনে সাধু ভাবে চলিতে পারে এবং পরিণত বয়সে মানবোচিত গুণে বিভূষিত হইয়া মনুষ্য নামের উপযুক্ত হয় তাহাই বাঞ্ছনীয়। মানবের আয়ুষ্কাল অতি অল্প, তাহাও সুখ-দুঃখ অভাব-অশান্তি দুঃখ-দৈন্যে ভরা। এই সকল অভাব অশান্তি দুঃখকে তুচ্ছ করিয়া ব্যর্থজীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। ইহাই মানবধর্ম্ম। জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির রাখা দরকার। এই ছাত্রজীবন হইতেই শিক্ষার মধ্য দিয়াই তাহাদের চরিত্র গঠন হওয়া আবশ্যক।

ছাত্রজীবনে যাহাতে শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা রক্ষা হয় তাহা একান্ত কর্ত্তব্য। সর্ব্বজীবের প্রতি দয়াবান, সকলের প্রতি আত্মবৎ সহানুভূতি বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

ছাত্রগণের প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করা কর্ত্তব্য। শয্যা হইতে উঠিয়া শৌচাদি সমাপন দন্তধাবন ও মুখপ্রক্ষালন করিবে; এবং শরীর সুস্থ থাকিলে প্রাতঃস্নান করিবে। স্নানের সময় গামোছাখানি ভিজাইয়া উত্তমরূপে গাত্র মার্জ্জনা করিলে শরীরের ময়লা ও দূষিত ঘর্ম্মাদি নষ্ট হইয়া শরীর সবল ও সুস্থ রাখে। যদি শরীর সুস্থ থাকে তবে প্রত্যহ শীতল জলে স্নান করাই কর্ত্তব্য গাত্রে অধিকক্ষণ জলবদ্ধ ভাল নহে। স্নানান্তে সুধৌত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক প্রাত্যহিক সন্ধ্যাবন্দনা করা উচিত; কেন না প্রাতঃকালই ভগবদুপাসনার প্রশস্ত সময়। এই সময়ে মন শান্ত ও উদ্বেগশূন্য থাকে। যিনি আমাদের সুখের জন্য ভোগের জন্য এ সংসারে কত অপূর্ব্ব বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আমাদের স্নেহের বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য পিতামাতা ভাইবন্ধুর স্নেহ-ভালবাসায় আমাদের জীবন সুখময় করিয়াছেন, সেই জগৎবরেণ্য পরমদেবের চরণে প্রতিদিন ভক্তিভরে প্রণাম করিবে।

যথাসময়ে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে গমন করিবে ও একান্তচিত্তে পাঠ অভ্যাস করিবে। আহারের সময় সংযতভাবে আহার করিবে। পবিত্র বিশুদ্ধ আহার্য্য ভোজন করিবে। আহারই মানবজীবনের প্রধান উপাদান। আহারীয় বস্তুগুলি যাহাতে বিশুদ্ধ হয়, অন্ন-ব্যঞ্জনগুলি সুপক্ক, সুস্বাদ ও লঘু হয়, এরূপ হওয়া প্রয়োজন। যে আহারে আয়ু বল ও স্বাস্থ্য আনয়ন করে সেইরূপ আহার করা কর্ত্তব্য। অধিক মৎস্য-মাংস আহার করা ভাল নয়। লোভের বশীভূত হইয়া গুরুভোজন করিবে না, গুরুভোজনে পীড়া হইয়া থাকে।

প্রত্যহ বিদ্যালয় হইতে আসিয়া সমস্ত দিনের পরিহিত ঘর্ম্মাদিদূষিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া ধৌত বস্ত্র পরিধান করিবে ও গা মুছিয়া ফেলিবে এবং হস্ত-মুখ প্রক্ষালনান্তে জলযোগ করিয়া কিছুক্ষণ ক্রীড়া ও ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য।

অধিক রাত্রিজাগরণ ছাত্রদের পক্ষে উচিত নহে। রাত্রি ১০টার মধ্যেই শয়ন করা কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ আলস্যের বশীভূত হইবে না। যে সময়ের যে কাজ তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করা উচিত।

সত্যের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও সকল কার্য্যে সকল চিন্তায় ছাত্রদিগের সত্যনিষ্ঠ হওয়া কর্ত্তব্য। প্রতিদিন ছাত্রগণের কিছু কিছু সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহা মনে রাখা উচিত। প্রত্যহ শয্যা হইতে উঠিয়া শৌচাদি সমাপন করিয়া মুখহাত ধুইয়া প্রাতঃকালে ভগবদুপাসনা ও তাঁহার ধ্যান, স্মরণ বা স্তুতি করা ছাত্রদের নিত্যন্ত কর্ত্তব্য, কেন না ধর্ম্মই মানবজীবনের মূলভিত্তি। বাল্যকাল হইতে বালকগণকে ধর্ম্মপথে চালিত করা কর্ত্তব্য। আজকাল ছেলেদের মনে প্রায়ই ধর্ম্মভাব বিকশিত হয় না। শিশুকাল হইতে যদি জননীগণ সন্তানগণের মনে ধর্ম্মভীরুতা জন্মাইয়া দেন, তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া নিশ্চয় ধার্ম্মিক হইয়া উঠে। কিন্তু বাল্য-

কালে যাহাদের মনে ধর্ম্মভীরুতা না জন্মে, পরিণত বয়সে তাহারা যথেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব হইয়া থাকে। এই জন্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা-দান কর্ত্তব্য।

সকল বিষয়ে নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে ছাত্র-দের চরিত্রগঠন হইয়া থাকে। ছাত্রজীবনে শান্ত সংযত হইয়া থাকা প্রয়োজন। তাহাদের প্রথম জীনের কর্ত্তব্য গুরুভক্তি ও গুরু বা শিক্ষকের আজ্ঞা পালন এবং পিতা-মাতার আজ্ঞা পালন ও তাঁহাদের সেবা। তৎপরে সংযম অভ্যাস। ছাত্রগণ ছাত্রজীবনে পবিত্র সরলহৃদয় দয়ালু অক্রোধী হইবে। সকলের সহিত মিষ্টব্যবহার করিবে, গুরুজনদিগকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিবে এবং রাজভক্ত হইবে। আমরা যে রাজার রাজ্যে বাস করি, সেই রাজাই আমা-দের ধন মান প্রাণ রক্ষা করেন। রাজাই প্রজার পিতৃ-তুল্য। শিক্ষকেরা এইরূপ রাজভক্তি বিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দিবেন। আজকাল এল-এ, বি-এ পাশ করিলেও বেশীর ভাগ ছাত্রকে উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব দেখা যায়। তাহারা পিতামাতা ও গুরুজনের আজ্ঞা পালনে অপমান বোধ করে এবং তাহাদের অধিকাংশকে দাম্ভিক অহঙ্কারী ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতি দেখা যায়। যাহাতে ছাত্রগণের ছাত্র-জীবন আদর্শজীবনে পরিণত হয়, তাহাই বাঞ্ছনীয়। যাহাতে তাহারা শান্ত সংযমী দয়ালু পরোপকারী হইয়া জগতের অশেষ কল্যাণকর কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে তাহাই প্রার্থনীয়। ছাত্রজীবনে সত্য শৌচ সম দম আর্জ্জব সরলতা অহিংসা মৈত্রী এই সকল গুণ ছাত্রদিগের হৃদয়ে বিশেষ পরিস্ফুট করা উচিত।

ছাত্রেরা মনে রাখিবেন, ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্যপালনই তপস্যা। আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে ছাত্রগণকে কিছু-কাল গুরুগৃহে বাস করিতে হইত। এমন কি দশম বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে পিতামাতা পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থ গুরুগৃহে পাঠাইতেন। অন্ততঃ দশ বৎসরকাল ছাত্রেরা ব্রহ্মচর্য্য পালন করতঃ গুরুগৃহে বাস করিতেন, তৎকালে গুরু বা শিক্ষক শুধুই তাঁহাদের অধ্যয়ন বা পাঠ দিয়া নিরস্ত হই-তেন না; যাহাতে ছাত্রদের চরিত্রগঠন হয়, যাহাতে তাহারা মানুষ হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে, সেই দিকে তাঁহাদের অধিক লক্ষ্য থাকিত। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই সংসারে এম-এ বি-এ উপাধিধারী বিদ্বাননামে পরিচিত অনেকে আছেন। কিন্তু চরিত্রবান ও কর্ত্তব্য পরায়ণ ব্যক্তি জগতে দুর্লভ। ছাত্রগণকে বাল্যকাল হইতে কর্ত্তব্যপালন করিতে শিক্ষাদান করা সর্ব্বতো-ভাবেই উচিত। বালকগণ শুধু তোতাপাখীর ন্যায় পাঠ অভ্যাস করিলেই তাহাদের চরিত্রগঠন হইবে না; বাল্য-কাল হইতেই ছাত্রগণ যাহাতে সত্যনিষ্ঠ, বিনীতস্বভাব, দয়ালু, পরোপকারী, সংযমী, মিতাচারী ও ধর্ম্মভীরু হয় এবং শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চরিত্রগঠন হয়, তাহাদের হৃদয়ে দয়া ভক্তি স্নেহ মৈত্রী প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ হয়, সেইরূপ শিক্ষা দেওয়াই বিশেষভাবে কর্ত্তব্য।

ছাত্রজীবনে সংযমী হওয়া উচিত, সকল বিষয়েই ছাত্রগণ সংযত হইবেন। কখন সত্যের অপলাপ করিবে না, পিতামাতা ও গুরুজনদিগকে সেবা করিবে, সর্ব্বদা তাঁহা-দের সেবা করিবে, তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালন করিবে এবং আহারে বিহারে শয়নে ভোজনে সংযমী ও ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইবে। ছাত্রজীবন গঠনের জন্য যে গুণগুলির প্রয়োজন, সর্ব্বদা সেইগুলি ছাত্রদের অভ্যাস করিতে হইবে; কেন না অভ্যাসই যোগ। এই অভ্যাসযোগ-শিক্ষার ফলে তাহাদের সদভ্যাসগুলি পালন করিতে করিতে ক্রমেই অভ্যাস হইয়া যাইবে। ছাত্রজীবনে সত্য, শৌচ, তপ, দম, আর্জ্জব, সরলতা, অহিংসা, অক্রূরতা, স্নেহ, দয়া, ভক্তি, পরোপকার প্রভৃতি গুণগুলি যাহাতে জীবনকে সুন্দর ভাবে গঠিত করিতে পারে এবং ভবিষ্যতে তাহারা মানুষ হইয়া মনুষ্য নামের পরিচয় দিতে পারে, ইহাই শিক্ষকের উদ্দেশ্য থাকা উচিত। শুধু বিদ্যা শিক্ষায় মানুষ, মানুষ হইতে পারে না। বিদ্যাশিক্ষায় প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করিতে পারে, ধন মান সম্পদ লাভ করিতে পারে; কিন্তু চরিত্রের পূজা লাভ করিতে পারে না। সচরাচর আমরা দেখিতে পাই, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেও মদ্যপায়ী চরিত্রহীন দাম্ভিক নিষ্ঠুর ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা বিদ্বান এবং প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন; তথাপি চরিত্রকারণে তাঁহারা সংসারে সুখশান্তি লাভ করিতে পারেন না। মানব যদি পরিণত জীবনে সুখ, শান্তি, মান, যশ চাহেন তবে তাঁহার চরিত্রগঠন হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এই হেতু ছাত্রজীবন হইতেই ছাত্রগণ সংযতচিত্ত ও দয়ালু হইয়া সর্ব্বভূতের হিতসাধন করিয়া নিজের ও অপরের দুঃখমোচনে যত্নবান হইবেন।

কুসংসর্গ ত্যাগ করিবেন। সংসর্গদোষেই মানবের অধঃপতন ঘটিয়া থাকে। সর্ব্বদা সৎকথা আলোচনা করিবে, সদ্ব্যক্তির সহিত আলাপ করিবে, সুরুচিপূর্ণ পুস্তক পাঠ করিবে। ছাত্রজীবনে বিলাস-ব্যসনে থাকা অনুচিত। অনাড়ম্বর সাদাসিধা পোষাক-পরিচ্ছদ পরা উচিত; এবং ছাত্রজীবনে গীতবাদ্য, মাল্য, গন্ধ ও বিলাসপ্রিয়তা অনু-চিত। আমরা দেখিতে পাই মানব চরিত্রগুণে দেবত্বও লাভ করিতে পারে এবং চরিত্রদোষে নিষ্ঠুর পিশাচও হইয়া থাকে। তাহাতেই সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, জগৎ চরি-ত্রেরই পূজা করিয়া থাকে, শুধু অর্থের পূজা করে না। ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য। প্রাচীন

কালেও এই নীতি ছিল যে ছাত্রগণ ছাত্রজীবনে যতকাল গুরুগৃহে বাস করিতেন, ততকালই তাঁহারা কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন। এই ব্রহ্মচর্য্যের বলেই ছাত্রগণের তেজ, বল, মেধা, পুষ্টি, কান্তি, স্মৃতি সব অক্ষুণ্ণ থাকিত। এখন আমরা দেখিতেছি ছাত্রগণের সেই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে তাঁহারা ভগ্নস্বাস্থ্য, দুর্ব্বল, রুগ্ন, স্মৃতি-মেধাহীন হইয়া পড়িয়াছেন; এবং ছাত্রজীবনের পবিত্রতা নষ্ট করিয়া অনেকে কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত ও বলহীন হইতেছেন। ছাত্রজীবনে শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা রক্ষা করা উচিত। নৈতিক চরিত্রবলের মূলে যে ব্রহ্মচর্য্য-পালন, ছাত্রগণ যেন তাহা মনে রাখেন। যে শিক্ষায় তাহাদের চরিত্রগঠন হয়, যে শিক্ষায় তাহাদের জীবন আদর্শ-জীবনে পরিণত হয়, যে শিক্ষায় তাহাদের মনোবৃত্তি সুমার্জ্জিত হয়, যে শিক্ষায় তাহারা স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া পরার্থে জীবনমন উৎসর্গ করিতে পারে, তাহাদের সেই শিক্ষাই বাঞ্ছনীয়। সংসারে এমন অনেক লোক আছেন, তাঁহারা লেখাপড়া শিখিয়া পণ্ডিত হইয়াছেন এবং প্রচুর অর্থোপার্জ্জনও করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় দয়া, ভক্তি, স্নেহ, মমতার পরিবর্ত্তে হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি দোষে কলুষিত। তাঁহারা ইহজগতে শান্তি সুখলাভ করিতে পারেন না, পরলোকে তাঁহারা শান্তি প্রাপ্ত হয়েন না। এই কারণেই বাল্যকাল হইতেই বালকগণের যাহাতে চরিত্র গঠন হয় যাহাতে তাহাদের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন হয় তাহারই চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যিনি এসংসারে আসিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করেন, তিনি তাঁহার পুত্র কন্যাগণকে প্রকৃত মানুষ করিতে সক্ষম হয়েন। কিন্তু নিজেকে উন্নত করিতে না পারিলে অন্যকে উন্নত করা অসম্ভব। যিনি এজগতে আসিয়া মনুষ্যত্ব লাভ না করিলেন তাঁহার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র।

—

নানা কথা।

ঈশ্বরের আশ্বাসবাণী—যে ঈশ্বর আছেন, যিনি ভাল বাসেন, মানুষ অন্তরে সেই ঈশ্বরের আশ্বাসবাণী শুনিতে চায়। যে বিষয় আমাদের বুদ্ধির অতীত, সেই বিষয় সম্বন্ধীয় তর্কবিতর্কের মধ্যে এই আশ্বাসবাণী শোনা যায় না। পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যে প্রত্যক্ষ নিভৃতালাপ হয় তাহার ভিতর দিয়াই এই আশ্বাস পাওয়া যায়। প্রত্যেক মানব জীবনে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে, প্রার্থনার উত্তরে যে সাড়া পায়, যে বল পায়, যে সান্ত্বনা পায়; মুক্তদ্বার হৃদয়ে যে শক্তি লাভ করে; পরমাত্মার সহিত যোগসাধনের ফলে মানব তাঁহার সহিত যে সহধর্ম্মিতা লাভ করে এবং সেই সহধর্ম্মিতার ভিতর দিয়া যে স্বর্গীয় করুণাধারা অন্তরে অনুভব করে, তাহারই ভিতর দিয়া এই আশ্বাসবাণী শুনিতে পাওয়া যায়।

বিলাতে পরিচ্ছদ—বিলাতে পরিচ্ছদের ঢং মধ্যে মধ্যে প্রায়ই পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা সকলেই জানেন। সম্প্রতি কাগজে দেখি, আগামী শীতের সময় দর্জ্জিদের ঘর থেকে মেয়েদের পোষাক নাকি বেশ একটু লম্বাটে হয়ে বেরোবে। সঙ্গে সঙ্গে লেখা আছে যে, মেয়েরা নাকি ইহার বিরোধী। এই শেষ অংশটুকু পড়ে মনে হয়, এই বিরোধটুকু যেন একটু got-up। আসল কথা, মেয়েদের শালীনতার অভাব দেখে দেখে সমাজ উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছে। দেখা যাক—শীতের সময় কি দাঁড়ায়। পরিবর্ত্তন হলে, আমরা বাঁচি, কারণ দাসমনোভাবের ফলে আমাদেরও দেশে নব্যবঙ্গের মহিলাদের মধ্যে প্রাচীন ভাবের শালীনতা রক্ষায় যত্ন আসা সম্ভব।

ইচ্ছা থাকিলেই পথ—বরিশালের গায়ক মুকুন্দ দাস কাশীপুর পল্লীতে একখানি বাড়ী ও তৎসংলগ্ন জমি ইত্যাদি (প্রায় ২০।২২ হাজার টাকার সম্পত্তি) একটী মহিলাশ্রম খুলিবার জন্য দান করিয়াছেন। তিনি বলেন এইরূপ একটী আশ্রম খোলা তাঁহার দীর্ঘকালের সংকল্প ছিল। তাঁহার মত লোকের পক্ষে এই দান বড়ই মহনীয়। আমাদের মনে পড়ে, তিনি কলিকাতায় যখন "দাদাঠাকুর" অভিনয় করেছিলেন, তখন সমস্ত সহরে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল; তাঁহার অভিনয়ের গুণে শ্রোতৃবর্গের অনেকেরই হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। কেবল আমাদের দুঃখ হয় যে, যে রাজা রামমোহন রায়ের কল্যাণে আজ সমগ্র ভারত সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও স্বাধীনতার পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেই রামমোহন রায়ের স্মৃতি বজায় রাখিবার জন্য কাহারও অন্তরে তেমন সাড়া জাগিয়া উঠে না। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ পাল রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি রাধানগরে যে স্মৃতিচিহ্ন দাঁড় করাইয়াছেন, তাহার জন্য তিনি আমাদের যথেষ্ট ধন্যবাদের পাত্র নিঃসন্দেহ। কিন্তু তথাপি আমাদের মনে হয়, যে আদি-ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন উপলক্ষ্যে রাজা রামমোহনের মহত্ত্ব বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছে, সর্ব্বপ্রথমে সেই আদি ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার ও তৎসংপৃক্তভাবে কোন আশ্রম প্রভৃতি সংস্থাপিত করিলে ধীরেন্দ্রবাবুর পরিশ্রম অধিকতর সার্থক হইত। আজ শতাব্দীর পরে জিজ্ঞাসার সময় এসেছে—বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে এমন কি কেহ নাই যিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযুক্তভাবে কোন প্রকার স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপনে

ইচ্ছা করেন? যাঁহার ইচ্ছা থাকিবে, তিনি পথও দেখিতে পাইবেন।

পত্রিকাপরিচয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, তত্ত্ববোধিনীর গত ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীবাণীদেবীর "শিশুদের সঙ্গীতশিক্ষার প্রয়োজন" সুধীবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। গত ১৬ই আশ্বিনের শিক্ষাসমাচারে উহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকার গত আশ্বিন সংখ্যা পাইয়া লিখিতেছেন:—

"আপনার গত ৫ই ও ৯ই ভাদ্রের উপদেশ পাঠ করিলাম। উপদেশগুলি সুন্দর হইয়াছে, বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। আপনি যে আশা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমিও সেই আশাকে সম্বল করিয়াই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ফলাফল বিধাতার হাতে। আরও মিলনের প্রয়োজন। শতবার্ষিকি সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহাতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ৯৯ বৎসরের পাঁজি-পুঁথি এক কথায় উড়ে যাবে এটা ঠিক নয়। নমস্কার, ইতি।"

Industry—August 1929—দুঃখের বিষয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় স্থানাভাব বশত গত দুই তিন মাস হস্তগত মাসিক পত্রিকাদির সমালোচনা করিতে পারি নাই; কিন্তু করা উচিত ভাবিয়া আবার উহাতে হস্তক্ষেপ করিলাম। আলোচ্য পত্রে "কৃতকার্য্যতার সোপান" মুখপ্রবন্ধটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও বিষয়ে গুরুতর। সংক্ষেপে কৃতকার্য্য হইতে গেলে যে মনোভাব হওয়া দরকার তাহা সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। "লজুঞ্জুশ" (lozenges) প্রস্তুত করিবার প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। যেরূপ কঠিন দিন-কাল পড়িয়াছে, আমাদের উপদেশ এই যে দশ-পাঁচ জনে মিলিত হইয়া দেশের লোক যৌথ কারবার খুলিয়া এই প্রকার শ্রমশিল্পে নামিয়া পড়ুন। "চর্ম্মসংস্কারপ্রণালী"র (Tanning Hides & skins) ২য় কিস্তি চলিতেছে। বিশেষজ্ঞের জন্য লিখিত হইলেও সাধারণের বোধগম্য হইয়াছে। অল্প মূলধনে অনেকগুলি কারবারের কথা দেওয়া আছে। শুধু ইহারই জন্য সম্পাদক মহাশয়কে শতমুখে ধন্যবাদ জানাইতেছি। দেশের দুর্দ্দিনে আজ না হোক কাল দেশকে বাঁচাইবার পক্ষে এগুলি যথেষ্ট সহায়তা করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

গৃহস্থমঙ্গল—ভাদ্র, ১৩৩৬; টোটকা চিকিৎসার কতকগুলি সুন্দর ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় যদি এগুলি একটা গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রিত করেন, তাহা হইলে দেশবাসীর প্রকৃত উপকারে আসিবে। "পুনাং গাছ" সম্বন্ধে বাহির হইয়াছে। আমি কটকে অবস্থানকালে শুনিয়াছিলাম যে, কিছুকাল যাবৎ পুনাংএর তেল রংএর কার্য্যে ব্যবহারের জন্য আমেরিকায় প্রেরণ করিয়া অনেকে বিশেষ লাভবান হইয়াছেন। সেখানে উহা দীপ জ্বালাইবার কার্য্যেই ব্যবহৃত হইত, রংএর কার্য্যে যে উহার সুচারু ব্যবহার হইতে পারে, তাহা ইতিপূর্ব্বে কেহই জানিত না। একজন সুপ্রসিদ্ধ হাকিম পুনাং তৈলের আর একটি মস্ত :গুণ আমাকে বলিয়াছিলেন—সকালে বৈকালে উহা ৫ ফোঁটা করিয়া একটু কাশীর চিনির সহিত খাইলে নাকি কঠিন মেহ রোগও আরোগ্য হয়। আমি ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। মনে হয়, ইহা মারাত্মক নহে; কারণ কটকে ছোট ছোট ছেলেপিলেকে পুনাং ফল চিবাইতে দেখিয়াছি। কবিরাজ শ্রীরজনীকান্ত বল মুন্সী কবিরত্ন "সর্পাঘাতে দেশবাসীর কর্ত্তব্য ও প্রাপ্ত ঔষধাদি" প্রবন্ধে অনেকগুলি দেশীয় ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। আমরাও অনেক রোগের অনেকগুলি ঔষধ সংগ্রহ করিয়াছি, সেগুলিও যথাসম্ভব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিব ইচ্ছা করিতেছি। এই সংখ্যায় বিলাতী বেগুন এবং হলুদ, এই দুইটির চাষের বিষয় দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা হা-চাকরী করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারা এই দুইটা বিষয়ে হাত লাগাইলে নিশ্চয়ই উপকার পাইবেন। যদি সত্যই কেহ কৃষিকার্য্যে অবতীর্ণ হইতে চান, আমরা তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছি। সম্পাদক মহাশয়কে আমরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় একটা সৎকথা উপহার দিতেছি—

"আঁতে তিতো দাঁতে নুন।
ভাত খায় তিনকুন॥
চোখে জল কানে তেল।
বৈদ্য চায় ভেল ভেল॥"

মানসী ও মর্ম্মবাণী—কার্ত্তিক, ১৩৩৬ "পিতা" নামে ভূমিকা দিয়া রঙ্গলাল প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা অনেক বড়লোকের পিতাদের ছবি বাহির করিয়াছেন, এবিষয়ে তাঁহার অধ্যবসায় বড়ই প্রশংসার যোগ্য। তিনি যে কার্য্য করিয়া যাইতেছেন, কয়েক বৎসর বাদে উহার যথার্থ মূল্য বোঝা যাইবে।

Industry—September 1929—ফল-সংরক্ষণ (Fruit Preservation) প্রবন্ধে আনারস, আম প্রভৃতি বিলাতী ধরণে রক্ষা করিবার প্রণালী সহজভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। সেই সঙ্গেই "জেলি" "জ্যাম" প্রভৃতি বিলাতী খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালীও দেওয়া হয়েছে। Malt vine-

gar প্রবন্ধটী যবের শিরকা প্রস্তুত সম্বন্ধীয় বটে, কিন্তু বিশেষজ্ঞের জন্য লিখিত। তারপর "কালী প্রস্তুত" প্রবন্ধটীতে দেশী ও বিলাতী কালী প্রস্তুতের প্রণালী বিস্তৃত করে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কারো কারো মতে কালী, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার প্রণালী ইতিপূর্ব্বেই খুব বেশী প্রচারিত হয়েছে। আমরা বলি, হোক না—যতই প্রচার হয় ততই ভাল। কে জানে কার হাতে কোন্ কাজটী খুলে যায়। Pottery Industryতে মৃৎশিল্প চীনামাটীর জিনিষ প্রস্তুত কালে যে সমস্ত যন্ত্র দরকার হয়, তার ছবি দেওয়া হয়েছে। গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য মূলগত যে আতর ও তৈল দরকার হয়, তাহার সচিত্র বর্ণনা যা দেওয়া হয়েছে, তা থেকে জিনিসটা বেশ সুবোধ্য হয়েছে। গিল্টি করা সম্বন্ধেও একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে। অল্প ধনে কারবারের কতকগুলি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। August সংখ্যায় সম্পাদক আশ্বাস দিয়াছিলেন যে অল্প ধনে কারবারের অনেক ইঙ্গিত September সংখ্যায় থাকবে, তাঁর সে আশ্বাস সার্থক হয়েছে। তিনি দেশবাসীকে স্বাধীন জীবিকার পথে চালাইবার জন্য যে প্রকার প্রয়াস পাইতেছেন, সেবিষয়ে সমালোচনাসূত্রেও আমরা তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিবার অবসর পেয়ে ধন্য হয়েছি।

শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ—শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩৩৬—গোত্র ও প্রবরসম্বন্ধীয় তত্ত্ব বড়ই ঔৎসুক্যজনক এবং ইহার সমাধানে যথেষ্ট গবেষণা দরকার। লেখক বড়ই সংক্ষেপে প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন। আমরা পণ্ডিতপ্রবর রাধাবল্লভ বাবুর নিকট এবিষয়ে আরও তথ্য লাভের আশা করি। কিন্তু তিনি প্রথমেই যে বিধান দিয়াছেন যে, সগোত্রে বিবাহ ব্রাহ্মণগণের পক্ষে সর্ব্বথা নিষিদ্ধ এবং স্বগোত্র বিবাহের সন্তান চণ্ডাল হইবে—তাহার সপক্ষে আমরা কোন প্রমাণ পাই নাই। মনুসংহিতায় উহা কেবলমাত্র "দ্বিজাতিগণের পক্ষে অপ্রশস্ত" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। "শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ গ্রন্থকার" প্রবন্ধে যাহাঁদের নাম দেওয়া হয়েছে, তাঁরা শকলেই যে শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ তাহার আর একটু প্রমাণ দিলে ভাল হইত, নচেৎ অস্বীকৃত হইবার সম্ভাবনা। সম্পাদক মহাশয় "নৃত্যাভিনয়ে হিন্দু মহিলা" প্রবন্ধে মহিলার নৃত্যাদির বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন। তিনি যদি ইহার মূলে গিয়া থিয়েটার প্রভৃতির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন, তবেই সুফল প্রসবের সম্ভাবনা। "লেবুর উপকার" প্রবন্ধে লেবুর অনেক গুণ বলা হয়েছে। কবিরাজী মতে লেবুর ব্যবহারে অনেক সুফল। আমার মনে পড়ে, রোমে একবার ম্যালেরিয়া কমিশন বসিয়াছিল; সেই কমিশন সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, কুইনাইন ম্যালেরিয়ার প্রকৃত ঔষধ নহে, কিন্তু লেবুর রস, গরম জল ও স্বল্প লবণই উহার প্রকৃত ঔষধ।

সৌরভ—ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩৩৬—"সুসঙ্গে শিকার" প্রবন্ধটী মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের উপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রবন্ধের "শিকারের স্বপক্ষে ছুটা কথা" এই রকম কোন একটা নামকরণ হলেই ভাল হইত।

মাতৃমন্দির—কার্ত্তিক ১০৩৬—"বাংলার মৃৎশিল্প" প্রবন্ধ মৃৎশিল্পী শ্রীনিতাই চরণ পালের অভিজ্ঞতার উপর লিখিত বলিয়া বড় সুন্দর হয়েছে। লেখক ঠিক বলেছেন —"দরিদ্র বিধবা ও নিরাশ্রয়ীদিগের ইহা একটী স্বাধীন জীবিকার অন্যতম পন্থা।" তিনি আরও বলেন যে ইহা দ্বারা দেশের অনেক পয়সা বাঁচানো যায়। ঠিক কথা। যদি কেহ আজকাল হগ মার্কেটে যান, তিনি দেখতে পাবেন সেখানে মাটির ঘোড়া বিক্রী হয়। আগে এই সমস্ত ঘোড়া বিলেত থেকে আসত—দাম প্রায় কুড়ি টাকা ছিল; এখন দেশী ঘোড়ার দাম ৫৲ থেকে ১০৲ টাকা। কিন্তু শুনেছি, এই ঘোড়াগুলো তৈরি করে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানই বেশী। অনেক দিন পরে শ্রীরত্নমালা দেবীর লিখিত কবি অক্ষয় বড়ালের "কনকাঞ্জলির" সমালোচনা পড়ে একটা অনুপম শান্তি পেলাম। অক্ষয় বড়ালের কবিতা এক সময়ে তরুণদের সাথী ছিল--এখন কেই বা তা পড়ে? যাক্ সমালোচনাটী বড়ই সংক্ষিপ্ত হয়েছে—অক্ষয় বাবুর কবিতার ভিতর যে একটা গভীর শান্তিধারা প্রবাহিত, সেটা ফুটিয়ে তুললে ভাল হইত। শ্রীমানকুমারী বসুর "অনুনয়" কবিতাটী বড় মিষ্ট লাগিল। সম্পাদক মহাশয় যে সকল বিলাতের পত্র প্রকাশ করছেন, এগুলি বেশ interesting, কিন্তু এগুলি তাঁর "বিলাত ভ্রমণের" পরিশিষ্টরূপে দিলে ভাল হইত। "পুরাতনী" প্রবন্ধে শ্রীসুখেন্দ্রলাল মিত্র দুইখানি প্রাচীন সংবাদপত্র সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক কয়েকটী কথা বলিয়াছেন। "সর্দ্দা বিল" প্রবন্ধে লেখক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় M-A, B-L, ঠিক বলেছেন—"যাহা আমাদের দেশের ও দশের কাজ, তাহা আমরা নিজেরা না করিয়া, কাপুরুষের মত শাসকসম্প্রদায়ের হাতে তুলিয়া দিতেছি।" * * * "আমরা কি চৈতন্যহীন যে, মনিব মহাশয়ের বেত্রাঘাত ও সবুট পদাঘাত পৃষ্ঠে না পড়িলে কার্য্য করিতে পারি না?" নিরপেক্ষ শিক্ষিত ভারতবাসীমাত্রেই লেখকের সহিত একমত হইবেন নিঃসন্দেহ। মাতৃমন্দিরে যে "রন্ধনবিদ্যা" প্রবেশ করিতেছে, ইহা সুলক্ষণ।

হোমিপ্যাথিক পরিচারক—৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা— সম্পাদক ডাঃ কে, কে, রায় এম-ডি (কালিফর্ণিয়া) এবং ডাঃ অজিতশঙ্কর দে এইচ, এম, বি। প্রাপ্তিস্থান—হোমিওপ্যাথি সার্চিং সোসাইটী, ৫নং ভিক্টোরিয়া রোড; পোঃ বরাহনগর; কলিকাতা।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, এই পত্রখানি ৩য় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসক যিনি যাহাই বলুন না কেন, আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, হোমিওপ্যাথি ঔষধের গুণে অনেকস্থলে আশ্চর্য্য ফল দিয়াছে। মফঃস্বলে হোমিওপ্যাথি ঔষধের ন্যায় আরোগ্যসাধনে দ্বিতীয় সহায় আছে কি না সন্দেহ!

প্রথম প্রবন্ধ—বিশুচিকা বা কলেরা—বর্ত্তমান কিস্তিতে ইহার ইতিবৃত্ত সুবোধ্য ভাষায় লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধ—"শান্তির সন্ধান"—ইহাতে নাটকাকারে হোমিও ঔষধসমূহের গুণাবলী প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছে। গুণানুসারে ঔষধগুলির নামকরণ হইয়াছে। ঔষধাদির গুণব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমরা এই নাটুকে প্রণালীর পক্ষপাতী নহি। ইহাতে সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধাই বেশী আসে। "হোমিওপ্যাথিক রঙ্গরসে" গালাগালিতে ব্যবহার্য্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। "আদর্শ প্রশ্নোত্তরমালা"য় কোনায়াম ঔষধের ব্যবহার প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্নোত্তর-ভাবে লিখিত বলিয়া আমরা মাথায় ঠিক ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। আমাদের মনে হয় Johnston প্রভৃতির প্রণালী অনুসারে theraputiesএর ব্যবস্থা করিলে সাধারণের বেশী সুবিধা হয়। হোমিও-প্যাথির প্রবর্ত্তক হ্যানিমানের "organon of medicine" এর অনুবাদ সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং করিতেছেন। ভাষা সুবোধ্য হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, কতদিনে যে শেষ হইবে তাহা বলা যায় না। "চিকিৎসা" প্রবন্ধে লেখক ডাঃ শ্রীকুঞ্জলাল সেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মর্ম্মকথা সুন্দর প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশের ডাঃ শ্রীরামেন্দ্রনাথ দাস এম, ডি, Retraction of penis (টোনা) রোগে Cuprum met. 6 এক ফেঁটা দিয়াই আশ্চর্য্য উপকার পাইয়াছেন। এই রোগে নাকি রোগী সহজেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তাই এই উপকারপ্রদ ঔষধ আমরাও পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম। "নির্দ্দেশক"এ সম্পাদক কতকগুলি সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকের নির্দ্দিষ্ট ঔষধ ও তাহার প্রয়োগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তন্মধ্যে কয়েকটি উদ্ধৃত করিলাম—

(১) রোগীর গাত্রের তাপ বর্ত্তমান অথচ right heart নিষ্ক্রিয় হইবার উপক্রম করিতেছে—তাহার জন্য Ammon carb ব্যবহার্য্য—G. Borick.

(২) স্ত্রীলোকের দুর্নিবার বন্ধ্যা রোগে natrum carb—E. Wright

(৩) পারদের বিষয় ঔষধগুলির মধ্যে, বিশেষত পারদের কুফল যখন ভীষণভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তখন Nitric Acidএর ব্যবহার বিবেচ্য—সি এম বোজার।

(৪) Injectionএর কুফলে অন্যান্য ঔষধের অপেক্ষা phosporusই সূচিত হয়। আর, হাইশ।

(৫) পৌনঃপুনিক স্ফোটকের (recurrent boils) জন্য arnicaর বিষয় চিন্তা করিবে। এইচ সি ব্লান্ট

(৬) যখন perforated woundoএর বাহ্যিক আকারের অনুপাতে টাটানি বা ব্যথা খুব বেশী থাকে, তখন Ledum অপেক্ষা Hyperium এর বিষয় অধিক চিন্তা করিবে। জে, এইচ ক্লার্ক।

আমাদের মনে হয় সম্পাদক মহাশয় উপরোক্ত ঔষধের কত potency ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা জানাইলে অনভিজ্ঞ জনসাধারণের বিশেষ সুবিধা হইত।

SCIENTIFIC INDIAN—Vol. I. no. 1 Editor J. Haldar M.sc. 22-1-1 Jeliatola Street, Calcutta, January 1929 annual subscription Rs 3.

ইহা বিজ্ঞানবিষয়ক একখানি ইংরাজী পত্রিকা। বাংলায় লিখিত হইলে আমরা বেশী সুখী হইতাম। কিন্তু আমরা যখন "বিলাতী ধরণে কাশি, ফরাসি ধরণে হাসি" তখন সম্পাদক মহাশয়কে দোষ দিই কেমন করিয়া? আজ ৬ই জুন, কিন্তু জানুয়ারী মাসের কাগজ—আজ পাইলাম। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার পুরো নাম দেন নাই, কাজেই তাঁকে হালদার মহাশয় বলেই অভিহিত করিব। আমাদের অনুমান হয় "statesmen" কাগজের "notes and querries"এ যিনি নানা বিষয়ে উত্তর দিতেন, ইনিই তিনি। তাহা যদি হয়, তবে ইহাঁর নানাবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ আছে এবং এরূপ একখানি পত্রিকা চালাইবার অধিকার আছে বলা যায়। আজ-কালকার বাজারে চাকরীর অবস্থা যেরূপ, তাহাতে স্বাধীন জীবিকার অনুকূল একখানি trash কাগজ বাহির হইলেও তাহার মূল্য আছে। তবে হালদার মহাশয়কে আমাদের অনুরোধ, তিনি যেন দেশকে, শুধু কাগজে লিখিয়া নহে, কিন্তু হাতে-হেতেড়ে, স্বাধীনজীবিকার পথে অগ্রসর হইবার বিষয়ে সাহায্য করেন। আলোচ্য সংখ্যায় দেশগৌরব স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর সংক্ষিপ্ত ও সচিত্র জীবন বাহির হইয়াছে। Possibilities in Agricultural Industries বা কৃষিশিল্পের প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত এস, হালদার (পুরো নাম জানি না) কৃষি-অবলম্বনে কোন্ কোন্ শিল্প সহজসাধ্য হয়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। এইবার যদি ঐ এক-একটী বিষয় একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন তো ভাল হয়। "কৃষিকার্য্যে বিজ্ঞান", "শিল্পবিষয়ক উন্নতি"

প্রভৃতি টুকি-টাকি বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ আছে। "শিল্প-বিষয়ক formula"তে যে কয়েকটি formula দেওয়া আছে, তন্মধ্যে faded ফটোগ্রাফ পুনরুদ্ধার করিবার যে formula দেওয়া হইয়াছে, সেইটী কজে আসিবে। বাকীগুলি যে ভাবে লিখিত আমরা তাহাতে সুখী নই —দেশের ছেলেরা হাতে-হেতেড়ে কি ভাবে কি কাজ করিয়া লাভবান হইতে পারে, আমরা সেই সমস্ত বিষয় সেই ভাবে লিখিত দেখিতে চাই। চিকিৎসার উপযুক্ত কয়েকটি recipes দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি দরিদ্রদের উপকারে আসিতে পারে। মাছের আঁশের সদ্ব্যবহার যাহা লেখা আছে, পরীক্ষা করিলে মন্দ হয় না।

জন্মভূমি—বৈশাখ ১৩৩৬—একটী সুন্দর সাধক সঙ্গীত দেওয়া হইয়াছে; আমরা তাহা উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা রাখি। "স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের দুই-একটী ঘটনা" প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে তাঁহার প্রাণের সরল উদার ভাব সুব্যক্ত হইয়াছে। "শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীতত্ত্বে" লেখক শাস্ত্রীয় তত্ত্বনির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছেন। অলক্ষ্মী যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, পড়িলেই মনে হয়, ইহার ভিতর অলক্ষ্মী দূর করিবার অনেক তত্ত্ব নিহিত আছে। এবিষয় কেহ গবেষণা করিলে মন্দ হয় না।

ভারতবর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৩৬—প্রচ্ছদের মুখেই স্বর্গীয় ব্যারিষ্টারপ্রবর উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া আছে। পুরাকালের অনেক স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। কংগ্রেসের সূত্রপাত অবধি কত কথাই না মনে উদিত হইতেছে। কণ্ঠের সেই উদাত্ত স্বর এবং হৃদয়ের সেই মহানুভবতা। তখন কলিকাতা "বারের" এখনকার মত দুর্দ্দশা ছিল না—একটা প্রকৃত সম্মানের ভাব বজায় ছিল। "পূর্ব্বরাগ" চিত্রটী মন্দের ভাল। সর্ব্বপ্রথম প্রবন্ধ "গুহ্যাৎ গুহ্যতরং"—শ্রীঅরবিন্দ লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধ হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনুদিত। ইহা গীতার নবম অধ্যায় এবং বিশ্বরূপদর্শন অবলম্বনে ব্যাখ্যা। বিশেষ কিছুই নূতনত্ব দেখিতে পাইলাম না—পড়িলে মনে হয় যে ইংরাজী দার্শনিক তত্ত্বকে দেশীয় পোষাকে দাঁড় করানো হইয়াছে। তদ্ব্যতীত অনুবাদটীও বেশ প্রাঞ্জল হয় নাই। "রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্যের ভূমিকা" প্রবন্ধে লেখক সিদ্ধান্তে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্যের অমরত্বলাভের কারণ বলিয়াছেন তাঁহার "অরূপ রূপের, অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সন্ধানে যাত্রা এবং অন্তর রহস্যের উদ্ঘাটন"। ইহা আংশিক কারণ হইলেও সম্পূর্ণ কারণ বলিয়া আমাদের মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যক্ষেত্রে অমরত্ব লাভের প্রধান কারণ আমাদের মনে হয় যে, তিনি যুগধারাকে বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিয়া তাহার একটী মূর্ত্তি দান করিয়া প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের এবং হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতি নূতন ও পুরাতন সর্ব্ববিধ ভাবসমন্বয়ের একটী ভাবধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় সেই ধারাকে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া তাহাকে একটী মূর্ত্তি দিয়া বিকশিত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি অমর হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পর যে কারণেই হৌক, সমগ্র দেশের মধ্যে হিন্দু ভাবের ধারা আসিয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথপ্রমুখ সেকালের যে সকল মনীষী উহা ধরিতে পারিয়া উহাকে মূর্ত্তিপ্রদানে বিকশিত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের সাহিত্য প্রভৃতির ভিতর দিয়া অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। সেইরূপ বঙ্কিমচন্দ্র অবধি সারা রবীন্দ্রনাথের যুগ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য ঢঙ্গের যে ভাবধারা অক্ষুণ্ণভাবে আজ পর্য্যন্ত চলিয়াছে বলিলেও বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যাঁহারা সেই ভাবধারাকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন, উপলব্ধি করিয়া পরিপাক করিয়াছেন, অর্থাৎ উহাকে নিজ নিজ ভাব, চিন্তা ও কল্পনাবিমিশ্রিত সমস্ত জীবনে মিশাইয়া লইয়াছেন এবং ঐ প্রকার মিশাইয়া লইয়া উহাকে মূর্ত্তি দিয়া সম্যক প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যে ও ভাবধারায় নিজ নাম ও কীর্ত্তি খোদিত রাখিতে পারিয়াছেন। প্রত্যক্ষই তো করিতেছি, League of Nations প্রভৃতির ভিতর দিয়া যে পাশ্চাত্য ঢঙ্গের বিশ্বপ্রেমের বাণী চারিদিকে ছড়ানো হইতেছে—সে বাণী দরিদ্র পরাধীন দেশের নিকট যতই কেন অন্তঃসারশূন্য হৌক না—সেই বাণীর অনুকূলে যাঁহারা দুটো কথা বলিয়া তাহাকে মূর্ত্তিদান করিতে পারিবেন, তাঁহারাই অমরত্ব লাভ করিবেন, তো ধরা কথা। প্রবন্ধলেখক মহাশয় মনে হয় একটু বেশী রকম বিজাতীয় চশমার ভিতর দিয়া বিষয়টীর আলোচনা করিয়াছেন। "জুরিক থেকে মনট্রো" ভ্রমণবৃত্তান্তটি সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। "ব্রতচারিণী" উপন্যাসের ১৯ ও ২০ পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইয়াছে। এ উপন্যাসে সামাজিক চিত্রের বেশ একটা স্নিগ্ধ ভাব প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু এত বড় উপন্যাসের ধারা মনে রাখা বড়ই দুরূহ হয়। বর্ত্তমান প্রথামত এপ্রকার বড় উপন্যাসের প্রথমেই পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত অংশের একটা চুম্বক বা synopsis দিলে ভাল হয়। "প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস" বড়ই সুন্দর। কিন্তু প্রবন্ধের প্রথমে রামপ্রসাদের যে সকল কবিতাকে হাস্যরসের মধ্যে ফেলিয়াছেন, আমাদের মনে হয়, সেগুলিকে উহাতে না ফেলিয়া গভীর ভক্তিরসের পর্য্যায়ে ফেলিলেই ভাল হইত। মধ্যে "ইঁদের মিছিল" একটী

সুন্দর চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এরূপ পুরাতন চিত্রগুলিকে যতই প্রকাশ করা যায়, ততই আর্ট বা চারুকলার সহায়তা হইবে আশা করা যায়। "সিংহল-দ্বীপ" প্রবন্ধে কুমার মুনীন্দ্র দেব মহাশয় লিখিতেছেন যে, সিংহলেও তিব্বতের ন্যায় স্ত্রীলোকের বহুস্বামী লইবার প্রথা আছে। মনে প্রশ্ন আসে যে, (১) এই প্রথা কি পূর্ব্বে অনেক স্থানেই প্রচলিত ছিল? (২) যদি প্রচলিত ছিল, তবে উঠিয়া গেল কেন এবং তাহার ইতিহাস কি? (৩) তিব্বত হইতে এই প্রথা সিংহলাদি স্থানে অথবা সিংহল হইতে তিব্বতাদি স্থানে উহা প্রচলিত হওয়া সম্ভব? এবিষয়ের গবেষণা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক হইবে নিঃসন্দেহ। লেখক সিংহলে বিবাহপ্রথা সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন—সুন্দর লাগিল। একস্থানে লিখিত আছে —বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিবার পূর্ব্বে "পাত্রের মাতা অন্দরে গিয়া কন্যাকে দৈহিক পরীক্ষা করেন"। এদেশেও তাহা ছিল—Eugeric theory সহজভাবে কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। রাণী শ্রীসুরুচিবালা চৌধুরাণীর "বন্ধু" গল্প পড়িয়া বড়ই ভয় হয়। আমাদের সমাজ কি তবে বিলাতী পঙ্কিল ঢঙ্গে গড়িতে চলিয়াছে? "বিবিধপ্রসঙ্গে" "ঋগ্বেদে সভ্যতা" এবং সিউড়ির নিকটবর্ত্তী মল্লিকপুরের মহিলাকবি "স্বর্ণলালী"র বিবরণ সুন্দর লাগিল। "বৎসদেশ—কৌশাম্বী" তে কৌশাম্বী সম্বন্ধে ইতিহাস যতদূর সম্ভব ডাঃ বিমলাচরণ লাহা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতে পুরাবৃত্ত-লেখকদিগের ইহা বিশেষ সহায় হইবে।

THE MESSAGE—October 1929— আমরা অক্টোবরের Message পাইয়াছি। বলা বাহুল্য, এই পত্রখানি সদানন্দজী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস মহাশয়ের হস্তে সুচারুরূপেই পরিচালিত হইতেছে। সর্ব্বপ্রথমেই রাজা রামমোহন রায়ের সেই সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত "বিগত-বিশেষং" ইংরাজী অনুবাদসহ প্রদত্ত হইয়াছে। এই গানেই আমরা সর্ব্বপ্রথম "বিগতবিবাদং" শব্দটী স্পষ্ট উল্লিখিত দেখি। কাগজের এক বৎসর অতীত হইয়া দ্বিতীয় বৎসর চলিতেছে এবং সেই উপলক্ষ্যে সদানন্দজী দেশ-বিদেশের সাধুগণের নিকট সাদর অভিনন্দন লাভ করিয়াছেন। আমরা যখন কাগজখানি পাই, তখন তত্ত্ববোধিনী ছাপা প্রায় শেষ হইয়াছিল। তাই আমরা আশ্বিন-সংখ্যায় আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতে পারি নাই। আমরা হইলাম সদানন্দের আত্মীয়, কাজেই আমাদের অপেক্ষা দেশবিদেশের অভিনন্দন অধিকতর মূল্যবান। যাই হোক, আমরাও সদানন্দজীকে এই কাগজ সুচারুরূপে পরিচালনের জন্য অন্তরের সহিত অভিনন্দিত করিতেছি এবং উহার দিন দিন উন্নতি হোক, এই আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে অভিমতগুলি সময়োপযোগী হইয়াছে। রাজা রামমোহন সম্বন্ধে ডাঃ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। আগামী সংখ্যায় উহা তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এই সংখ্যার সঙ্গে বাঁধাইয়া রাখিবার উপযুক্ত রাজা রামমোহন রায়ের একটী ফোটো-ব্লক দেওয়া হইয়াছে—সুন্দর ছাপা। "কৃষ্ণ ও খৃষ্ট"-বিষয়ক একটী কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ আছে। গীতা ও বাইবেলের অনেকস্থলে সাদৃশ্য দেখানো হইয়াছে। ইহা কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের স্মরণ হয়, পড়িয়াছিলাম, খৃষ্ট ভারতে আসিয়া ভারতের ধর্ম্ম আলোচনা করিয়াছিলেন। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক মহোদয়ও তাঁহার গীতা-রহস্যে এবিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। পরিশিষ্টে "ভারতের মুক্তিফৌজ" নামক একটী প্রবন্ধ আছে—বড় সুন্দর। কিসে ভারতের প্রকৃত মুক্তি হইবে, তাহার কার্য্য-প্রণালীর একটা কাঠামো দেওয়া হইয়াছে। ইহা অবলম্বনে আমাদেরও এবিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা রহিল। এক কথায়, এই আলোচ্য সংখ্যা বিষয়-সম্ভারে বড়ই গুরুভার। অল্প পরিসরের মধ্যে এতগুলি ভাল প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ইহা সদানন্দজীর কম গৌরবের বিষয় নয়।

গ্রন্থপরিচয়।

ভগবৎপ্রসঙ্গ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত। ২২৭ পৃষ্ঠা—মূল্য ১৷৹।

আলোচ্য গ্রন্থ অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত; এই অধ্যায়গুলির মধ্য দিয়া গ্রন্থকার ব্রহ্ম ও জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির মধ্য দিয়া হিন্দুর পারলৌকিক তত্ত্বে উপনীত হইয়া উপসংহার করিয়াছেন। প্রত্যেক অধ্যায়ে গ্রন্থকারের গবেষণা, সূক্ষ্ম বিচার-শক্তি এবং সত্যনির্ণয়ে তীব্র ইচ্ছা সুপরিস্ফুট। কিন্তু এই সঙ্গে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতও আলোচনা করিলে ভাল হইত। প্লেটোর Transmigration of soul এবং অলিভার লজের পারলৌকিক আলোচনাও পারলৌকিক তত্ত্বের মধ্যে স্থান পাওয়া উচিত ছিল মনে হয়। বিশেষত "ব্রহ্ম ও জগৎ" প্রবন্ধে হেগেলের Christian Trinityর ব্যাখ্যা উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিলে বিষয়টি আরও স্ফুটতর হইত বলিয়া আমার বিশ্বাস। তারপর "গীতার কর্ম্মবাদ" প্রবন্ধে আচার্য্য শঙ্কর এবং আচার্য্য রামানুজ কর্ম্ম সম্বন্ধে কি ভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং আচার্য্য শঙ্কর কর্ম্মকে মুক্তির পরিপন্থী বলিলেন

কেন, ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত হইলে সংশয় নিরসনে অধিকতর সুবিধা হইত। অদ্বৈতবাদ প্রবন্ধে Spinoza এবং Bradlayর মতবাদ আলোচনাও অপ্রাসঙ্গিক হইত বলিয়া মনে হয় না। মোটের উপর, পুস্তকখানিতে Comparative study বিশেষ স্থান পায় নাই। "বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রবন্ধে সাংখ্য, বাইবেল ও মনুর সৃষ্টিতত্ত্ব পাশাপাশি ভাবে আলোচিত হইলে বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্বের বিশেষত্ব সহজে হৃদয়ঙ্গম হইত।

"ব্রহ্ম সগুণ না নির্গুণ" প্রবন্ধে তিনি যে ভাবে সত্য-নির্ণয়ে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা বড়ই প্রশংসার্হ। ব্রহ্ম যদি বাস্তবিক নির্গুণ হন তবে উপাসনার প্রয়োজন থাকে না। আচার্য্য শঙ্কর নির্গুণ ব্রহ্মের অবতারণার পর পুনরায় গঙ্গার স্তব রচনা করেন কি প্রকারে? কাজেই তাঁহাকে inconsistent বলা অসঙ্গত হয় বলিয়া মনে হয় না।

মোটের উপর পুস্তকখানি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে এবং ইহার নামও সার্থক হইয়াছে; কারণ ভগবানের বিষয় লইয়াই ভক্তিপ্রবন্ধ রচিত। আশাকরি সাধারণ্যে ইহার বহুল প্রচার হইবে। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ

শোক-সংবাদ।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র সুধীন্দ্রনাথ বিগত ২১শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার প্রাতে ৭॥ ঘটিকায় ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে মহর্ষি-পরিবার হইতে একটি উজ্জ্বল রত্ন খসিয়া পড়িল। বিলাস একদিনের জন্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ছোট ছোট গল্পরচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। সমগ্র পরিবারে তাঁহার ন্যায় নির্বিরোধ লোক ছিলেন কিনা সন্দেহ। বর্ত্তমান সময়ের সাহিত্যিকগণের সহিত তাঁহার যথেষ্ট সৌহার্দ্দ ছিল। তিনি আপনার সরল স্বভাবের প্রভাবে সকলেরই শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণ করিতেন। সাহিত্যপরিষদের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। অনেক সময়ে দেখিয়াছি, শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সুধীন্দ্রবাবুর সহিত তাঁহার নীচের ঘরে মিষ্টালাপ করিতেছেন। সুধীন্দ্রনাথের ছোট ছোট কবিতা তাঁহার সুমার্জ্জিত লেখনী-প্রসূত ও সুপাঠ্য। সুধীন্দ্রবাবু ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ৩০শে আষাঢ় তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তাঁহার পারিবারিক জীবন মধুময় ছিল। তাঁহার অভাবে বন্ধুবান্ধবেরা শোকার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পরম মাতা পরলোকগত আত্মাকে তাঁহার সুশীতল ক্রোড়ে গ্রহণ করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের অন্তরে শান্তিবারি বর্ষণ করুন।

মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই ই—দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বিগত ২৫শে কার্ত্তিক সোমবার রাত্রি ১॥ ঘটিকার সময় বহু লোককে কাঁদাইয়া তাঁহার সার্কুলার রোডস্থিত বাটীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম সপ্ততি বৎসর হইয়াছিল। ধনের যে কি প্রকারে সদ্ব্যবহার করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে মহারাজা যে আদর্শ রাখিয়া গেলেন, তাহা এদেশে কেন, জগতে বিরল। মহারাণী স্বর্ণময়ীর দেহান্তের পরে যে বিপুল বিষয়-বৈভব তাঁহার হস্তগত হয়, তাহার আয় হইতে প্রায় এক কোটী টাকা তিনি দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার সুমিষ্ট প্রকৃতির গুণে সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অনেকে তাঁহাকে 'অর্দ্ধবঙ্গেশ্বর' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। কত অনাথা কত অসহায় কত শিক্ষার্থী তাঁহার নিকট হইতে কতরূপে সাহায্য লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। তিনি অনেক যুবকের বিলাতের সমস্ত ব্যয় নিজ হইতে বহন করিয়াছেন। সেই স্বদেশী যুগের প্রথম হইতে যে সমস্ত দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গাড়িয়া উঠিয়াছে, মহারাজার দান তাহার অধিকাংশকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল। "একেনৈব ত্যাগেন অমৃতত্ত্বমানশুঃ" উপনিষদের এই মন্ত্রের সার্থকতা তিনি আপন জীবনে প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। তিনি এখন অমৃতলোকে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। সমগ্র দেশ তাঁহার জন্য হাহাকার করিতেছে, ইহাই তাঁহার পরিবারবর্গের পরম সান্ত্বনা।

৺যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী—দিনাজপুরের অন্তর্গত হরিপুর গ্রামের অন্যতর প্রাচীন জমিদার-বংশের জমিদার ৺ বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী গত ৯ই কার্ত্তিক শনিবার পরলোকগমন করিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তিনি বড়ই সাধুপ্রকৃতি ও উদারহৃদয় ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব হইলেও আদি-ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান ছিলেন। নবাব আলবার্দ্দি খাঁয়ের সময় অবধি ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা জমিদার। তিনি নির্ম্মলচরিত্র ও সুপণ্ডিত ছিলেন। সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি বৃদ্ধা জননী, স্ত্রী, দুইটী উপযুক্ত পুত্র, একটী কন্যা এবং পৌত্রাদি রাখিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর হইয়াছিল। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান পরলোকগত আত্মাকে স্বীয় সুশীতল ক্রোড়ে স্থান দান করুন।

নিবেদন।

শ্রীযুক্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়ের অসুস্থতানিবন্ধন পত্রিকা যথাসময়ে প্রকাশ হইতে পারে নাই। সে কারণ ত্রুটী মার্জ্জনীয়।

একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দ্বাবিংশ কল্প—তৃতীয় ভাগ

সংখ্যা ১০৩৬ | ১৮৫১ শক অগ্রহায়ণ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে চলিতেছে। সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০০। সাল ১৩৩৬। শক ১৮৫১। খৃঃ ১৯২৯। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩০।

মাতৃ-মঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৬। পথের ধারে

পথের ধারে পড়িয়া ছিলাম—মা! আজও দেখ, পথের ধারে এক কোণে পড়িয়া আছি! ডাকিতেছি তো ডাকিতেইছি, কাঁদিতেইছি তো কাঁদিতেইছি—কে-ই বা তাহা শোনে! তুমি যাহাকে ছাড়, তাহার তো এই দশাই হয়—মরণ তো তাহাকে ছুঁইয়াই থাকে। শুনিতে তো পাই যে, চারিদিকে নাকি হাসিরাশি ছড়াইয়া আছে—চাঁদ হাসে, ফুল হাসে; নদী গান গায়, সাগরে সঙ্গীত ওঠে; কিন্তু জানি না, কেন, তোমার এই মরণ-ছোঁয়া ছেলের কাণে সে সঙ্গীতও পৌঁছায় না, আর তাহার প্রাণে সে হাসি, সে আনন্দ এতটুকু স্পর্শও করে না। আমি নিজের ব্যথায় নিজেই মরি। আমার এই রক্তধারা কে-ই বা মুছাইয়া দেয়,—আর প্রাণের ভিতর যে আগুন দিবানিশি হু-হু করিয়া জ্বলিতেছে কে-ই বা তাহাতে শান্তিজল ঢালিয়া সেই আগুন নিভাইয়া দেয়! মা আমার! তুমি একটুখানি আদর কর। যে ভালবাসা দিয়া তুমি আমাকে জগতে পাঠাইয়াছিলে, তাহার উপর তো আর দাবী করিতে পরি না। তাহারই একরত্তি দিয়া আমাকে আর একবার বুকে তুলিয়া লও—আমি ঐ একটুখানি স্নেহ পাইয়া মরিতে চাই। তুমি আমাকে কোলে তুলিয়া না লও—ভাল, আমি এই আঁধার কোণে পড়িয়া থাকিব, তবু তোমার সন্তান হইয়া আমি অপর পাঁচজনের দুয়ারে দুয়ারে গিয়া সুখশান্তির ভিখারী হইতে পারিব না। জননী আমার! মনে রেখো, আমি তোমার হারানো ছেলে ফিরিয়া আসিয়াছি। এ ছেলে আর কখনও তোমাকে ছাড়িয়া বিপথে যাইবে না। এই হারানো ছেলেকে ফিরিয়া পাইয়াও যদি ইহাকে না লইতে চাও—লইও না। এই যে সমস্ত পথিক রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে আমার দিকে এক-একবার করুণ দৃষ্টি ফেলিতেছে, এইটিই আমার প্রাণের অন্তস্তম প্রদেশ পর্য্যন্ত কুরিয়া দিতেছে। আমাকে এই রকম পথের ধারে এক কোণে ফেলিয়া রাখিয়াছ বলিয়া তোমার নামে যে নিষ্ঠুর মা বলিয়া নিন্দা রটিবে, সেইটাই আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট দিতেছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার চোখের জল শুকাইয়া যাইতেছে—একবার এসো মা—একবার এসো—আর তো পারি না। তোমার স্নেহ-প্রেমে একবার ডুবিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়।

৪। দায়ী কে?

জননী আমার! আমায় ছাড়িয়া তুমি কোন্ লোকে আছ, তাহা জানি না। তুমি যে লোকেই থাক, তুমিও আমাকে ছাড়িতে পার না, আমিও তোমাকে ছাড়িতে পারি না। আমায় যদি তুমি ছাড়িয়াই থাকিবে, তবে তুমি আমায় জন্ম দিলে কেন? আমায় জন্ম দিবার জন্য কখনও তোমাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম বলিয়া তো মনে পড়ে না। আমি জানিতামই না যে এই পৃথিবীতে আমায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। আমি যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সুখদুঃখ ভোগ করিতেছি, তোমার প্রাণে ব্যথা ও আনন্দ দিবার অধিকার পাইয়াছি—মা! ঠিক বল, এ সমস্তের দায়ী কে? আমি তোমার আদেশের বিরুদ্ধে গিয়া তোমাকে যে বড় ব্যথা দিয়াছি, অনেক কষ্ট দিয়াছি, তাহা জানি। কিন্তু তাহাতে কেবল তোমারই প্রাণে কি ব্যথা দিয়াছি? তাহা নয়। তাহার ফলে আমি নিজে যে ব্যথা পাইয়াছি, সে ব্যথা যে আমরণ আমাকে বহিতে হইবে। তাহার জন্য আমি মর্ম্মে মর্ম্মে যে ব্যথা অনুভব করিতেছি, তাহার কি তুলনা আছে? তাহার তুলনা নাই—মা! তাহার তুলনা নাই। জননী আমার! তোমাকে ব্যথা দিবার এবং সেই সঙ্গে আমার নিজেকেও কশাঘাত করিবার যে অধিকার পাইয়াছি, তাহাতেই আমার সুখ, তাহাতেই আমার আনন্দ। এই অধিকারই আমায় বলিয়া দিতেছে—তুমিই আমার মা, আর আমি তোমারই সন্তান।

৫। মা—মা—

জননী আমার! মা আমার! একবার তোমায় প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাকিতে দাও। কি মধুর নাম—কি মধুর! ডাকিতে ডাকিতেই প্রাণটা কেমন শীতল হয়—সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইয়া যায়। তোমার স্নেহ-প্রেম, তোমার করুণা বর্ণনা করিতে গেলে বাক্য সরে না—মনের ভিতর কি-এক সুখের বেদনাই কেবল তোলপাড় খায়। তোমাকে আমি নিজেই সম্পূর্ণ বুঝি নাই, অপরকে বোঝাই কেমন করিয়া? তোমার কথা যখন বলিতে যাই, তখন কথা তো আর বাহির হয় না—সমস্ত কথা থামিয়া যায়; রসনা নিস্তব্ধ হয়, মন হাঁপাইয়া ওঠে। প্রাণের ব্যথা তখন চক্ষু হইতে গণ্ডদেশ বাহিয়া শতধারে অশ্রুর আকারে ঝরিতে থাকে। তখন জগতসংসার সকলই বিলুপ্ত হইয়া যায়, কিছুই দেখিতে পাই না। তখন কেবল একটী মাত্র ইচ্ছা প্রাণের ভিতর জাগিয়া থাকে—তোমার বুকের মধ্যে মুখখানি লুকাইয়া কেবল অনাহত স্বরে মা মা বলিয়া ডাকি, আর ডাকিতে ডাকিতে সংসার হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাই—আমার নামটী তোমারই কাছে জাগিয়া থাক। মা! একবার তুমি আমাকে তোমায় শতবাহুতে আঁকড়াইয়া ধরিতে দাও, আর তোমার নয়নে নয়ন রাখিয়া প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাকিবার শক্তিসামর্থ্য আর অধিকার দাও।

আরাধনা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি
শান্তং শিবমদ্বৈতং
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং॥

যিনি আমাদের স্রষ্টা পাতা ও সর্ব্বসুখদাতা; যিনি আমাদের জীবনের জীবন ও সকল কল্যাণের আকর; আমরা যাঁহার প্রসাদে শরীর ও মন, যাঁহার প্রসাদে বুদ্ধি ও বল, যাঁহার প্রসাদে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ করিতেছি; যিনি আমাদের শরীর মন ও আত্মাকে নানাপ্রকার বিঘ্ন হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছেন; তিনি সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্ম; তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি শান্ত মঙ্গল ও অদ্বিতীয়। তিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ।

তাঁহার সত্তাতে এই বিশ্বজগত পরিপূর্ণ। এই বিশ্বচরাচরের প্রত্যেক অণুতে পরমাণুতে তিনি স্বপ্রকাশ। সুদূর অতীতে তিনি যেমন ঋষিমুনিদিগের সম্মুখে স্বপ্রকাশ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমানে আমাদেরও নিকট তিনি সেইরূপ স্বপ্রকাশ। আমরা অন্তরে সুস্পষ্ট জানিতেছি যে, তিনি অনন্ত ভবিষ্যতেও এই বিশ্বচরাচরে স্বপ্রকাশ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত থাকিবেন।

তিনি স্বয়ম্ভূ ও সর্ব্বব্যাপী। আমাদের আত্মা যেমন আমাদের শরীরের প্রত্যেক অংশ, প্রত্যেক অণুপরমাণু ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, অথচ তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, সেইরূপ সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম এই বিশ্বচরাচরের প্রত্যেক অণুপরমাণু ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, অথচ তিনি ইহার কোনও অংশই নহেন। সূর্য্য হইতে সূর্য্যরশ্মি যেমন

নিঃসৃত হয়, সেইরূপ তাঁহার ইচ্ছাতে তাঁহারই শক্তি হইতে এই বিশ্বজগত সৃষ্ট হইয়াছে—নিঃসৃত হইয়াছে। তিনি ইহার অকৃত কারণ। সৃষ্টির কারণ সৃষ্টির অতীত ইচ্ছাময় পরব্রহ্ম। তাঁহার আদি নাই, কারণ নাই; তাঁহার অন্তও নাই। তিনি অনাদ্যনন্ত ভূমা পরব্রহ্ম। তিনি নিরবয়ব। তিনি আত্মার অন্তরাত্মা থাকিয়া সর্ব্বকালে প্রাণীগণকে যথোপযুক্ত অর্থসকল বিধান করিতেছেন।

তিনি মনীষী—মনের নিয়ন্তা। তাঁহার জ্ঞানজ্যোতিতে অতীতের সহস্র সহস্র যুগের মানবাত্মা যেমন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, বর্ত্তমানেও তেমনি কোটী কোটী মানব নব নব জ্ঞানকণা লাভ করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও সহস্র লক্ষ যুগ ধরিয়া মানুষ তাঁহারই জ্ঞানকণা লাভ করিয়া দেবত্বে উন্নীত হইবে। তাঁহার মঙ্গলবিধানে মনুষ্য নিজেকে জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত করিতে পারে। তাঁহার সে বিধানের প্রতি মনোযোগ না দিয়া, জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতিরূপ ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্য ভুলিয়া, মানুষ যখনই প্রবৃত্তির দাস হয়, তখনই সে শাস্তি পাইয়া মঙ্গলের পথে ফিরিতে বাধ্য হয়।

যাঁহারা তাঁহার প্রদর্শিত জ্ঞান ও ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হন, তাঁহারা তাঁহার মঙ্গলমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দসাগরে অবগাহন করেন এবং তাঁহাকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি করেন। তখন তাঁহারা মৃত্যুর বিভীষিকায় ভীত হন না; তাঁহারা অমৃতস্বরূপের সংস্পর্শে মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। আশ্চর্য্য তাঁহার করুণা! তাঁহার জ্ঞান দিয়া, তাঁহার প্রেম দিয়া তিনি ক্ষুদ্র মানব আমাদিগকে তাঁহার সহিত সমধর্ম্মী করিয়া দিয়াছেন—আমাদিগকে অমরধর্ম্মা করিয়াছেন।

যে সাধক তাঁহাকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার শান্ত রূপও প্রত্যক্ষ করেন—তিনি তাঁহার অন্তরের অন্তরে অবস্থিত "শান্তিসমুদ্র অতি গভীরে" ডুবিয়া গিয়া অপার শান্তি লাভ করেন। তিনি সেই দেবদেবের মঙ্গলভাবের পরিচয়, তাঁহার শিবস্বরূপের পরিচয়, তাঁহার মঙ্গল হস্তের ছাপ গাছের প্রতি পত্রে, পাখীর গানের প্রতি তানে, গ্রহনক্ষত্রের প্রেমপূর্ণ প্রতি চাহনিতে, প্রতি নিমেষের প্রত্যেক ঘটনায় মুদ্রিত দেখেন। আমরা যে সুখসম্পদ প্রভৃতিকে মঙ্গল মনে করি, তাহারও মধ্যে তিনি যেমন তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য নিহিত দেখেন; দুঃখবিপদ প্রভৃতি যাহাকে আমরা অমঙ্গল মনে করি, তাহারও মধ্যে তিনি তেমনই তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা লুক্কায়িত দেখেন।

জগতের প্রত্যেক ঘটনায়, প্রতি নিমেষে ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় বিকীর্ণ থাকিলেও আমরা অনেক সময়ে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার অবসর হেলায় হারাইয়া ফেলি। আমরা অনেক সময়ে মোহান্ধ নয়নে দেখিতে পাই না যে, বিশ্বজগতের প্রতি নিমেষের প্রত্যেক ঘটনা বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গল ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হইতেছে বলিয়া শত অমঙ্গলেরও পরিণামে আমরা মঙ্গলেরই রাজ্যে চলিয়াছি; শত নিরানন্দ ভেদ করিয়াও বিশ্বজগত আনন্দেরই স্রোতে ভাসিয়া চলিতেছে। এই যে জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্বজগত উন্নতির পথে ছুটিয়া চলিতেছে, কত শত রবি চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র একসূত্রে বাঁধা পড়িতেছে, ওপারের সঙ্গে এপারের মহা প্রেমবন্ধন ঘটিতেছে, এসমস্তের ভিতর অধিকাংশ সময়েই আমরা ভগবানের মঙ্গল হস্তের পরিচয় দেখিতে ভুলিয়া যাই। কূটতর্ক ছাড়িয়া দিলেই আমরা সহজেই অন্তরে উপলব্ধি করিব, নিঃসংশয়ে বলিতে পারিব যে, যিনি আমাদের স্রষ্টা, যিনি আমাদের প্রত্যেকের পিতামাতা, তিনি নিশ্চয়ই মঙ্গলস্বরূপ—শিবং। তিনি অন্ধ শক্তি নন।

তিনি অদ্বিতীয়। আমাদের যিনি উপাস্য দেবতা, তাঁহার দ্বিতীয় কেহ নাই। তিনি অপ্রতিম। তিনি অদ্বিতীয় বলিয়াই কোথায় সূর্য্য আর কোথায় এই পৃথিবী, সর্ব্বত্রই একই নিয়ম কার্য্য করিতেছে। তিনি পূর্ণমঙ্গল। তিনি মৃত্যুর অতীত। সুতরাং মৃত্যুর সহচর পাপতাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি নিরবদ্য নিরঞ্জন। এসো, আজ এই পবিত্র স্থানে শুভমুহূর্ত্তে আমরা অনন্যমনা হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক স্বীয় আত্মাকে সেই অদ্বিতীয় মঙ্গলস্বরূপে সমাধান করি।

—

ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার।

(সদানন্দ শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

ব্রাহ্মসমাজ—আমাদের আদরের ব্রাহ্মসমাজ—ক্রমশঃই অবসাদগ্রস্ত হইয়া চলিয়াছে, একথা আজ কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান নেতাগণ সম্পূর্ণ উদাসীন। এই অপ্রিয় সত্যটি হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াও তাঁহারা ইহাকে প্রকাশ করিতে সাহস করেন না, প্রতীকারের কথা ত দূরে থাকুক। এদিকে ব্যাধি ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। এখনও চিকিৎসার সময় আছে। কিন্তু বলে কে, আর করে কে?

আমি অনেক দিন হইতে এবিষয়ে সমাজের নেতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছি। বৎসর

বৎসর সমাজমন্দিরে কাতরকণ্ঠে ব্রাহ্মসাধারণের নিকট অনুনয়-বিনয় করিতেছি, সমাজের কর্তৃপক্ষগণকে ইহার গুরুত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু হায়! কেহই আমার কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না, কেহই আমার সহিত সহানুভূতি করিতে প্রস্তুত হইতেছেন না! সম্প্রতি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার হৃদয়ে কিঞ্চিৎ আশা সঞ্চারিত হইল।

যে সকল কারণে ব্রাহ্মসমাজের পতন হইতেছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। "জানি না" বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে; সমাজের অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কেহই ইহা প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে সাহসী নহেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে ঘরের কথা বাহির হইয়া পড়িলে সমাজের মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক অমঙ্গল হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি যে ব্যাধি চাপিয়া রাখিলে কি সমাজের মঙ্গল হইবে? এখন হইতে প্রতীকারের চেষ্টা না করিলে কি তাঁহারা সমাজকে অধিক দিন জীবিত রাখিতে পারিবেন?

ব্রাহ্ম-সমাজের জীবনীশক্তি সাধনা। এই সাধনার বলে মহর্ষিপ্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের ঋষিগণ ব্রাহ্ম-সমাজকে দেশের আদর্শ করিয়া তুলিয়াছিলেন; কিন্তু আজ—সে সাধনা কোথায়? এই সাধনার অভাবে ব্রাহ্মসমাজের নৈতিক আদর্শ, যাহা একদিন শত শত শিক্ষিত যুবককে আকর্ষণ করিয়াছিল—আজ তাহা ক্ষীণ মলিন নিস্তেজ ও হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। কোথায় আজ সেই ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ত্যাগ, কোথায় সেই ব্রাহ্মসমাজের উদারতা এবং ভ্রাতৃপ্রেম, কোথায় সেই ব্রাহ্মসমাজের সত্যনিষ্ঠতা, কোথায় সেই ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ চরিত্রশুদ্ধি, কোথায় সেই ব্রাহ্মসমাজের সেই প্রবল স্বদেশপ্রীতি! ইহা কি প্রকৃত সত্য নহে যে, যে সকল ব্রাহ্মেতর সম্প্রদায় ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ সমাজকে মার্জ্জিত, সুসংস্কৃত এবং পুনর্গঠিত করিয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে প্রায় সকল বিষয়েই আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন; আর আমরা ক্রমে পিছাইয়া পড়িতেছি? ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে!

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রী সাধনের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের—কেবল ভারতবর্ষের কেন—সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল সাধিত হইবে। জগৎপ্রসবিতা পরমেশ্বরের প্রতি তাঁহার দৃঢ় ও অটল বিশ্বাস ছিল। সুতরাং তিনি ব্রহ্মের একত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব সম্যক উপলব্ধি করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কি ধর্ম্মসমস্যায়, কি সমাজসংস্কার-কার্য্যে, কি জাতীয় জীবনগঠনে, সকল বিষয়েই এই মৈত্রীসাধনা তাঁহার মূল মন্ত্র ছিল। সকল সম্প্রদায়ের লোক যাহাতে অবিরোধে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারে ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য এবং একান্ত প্রার্থনা ছিল। এই নিমিত্তই তিনি ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডিড সম্পূর্ণ উদার এবং অসাম্প্রদায়িকভাবে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

কিন্তু হায়! এখন আমরা কি দেখিতেছি? আমরা ব্রাহ্মসমাজের আদি গুরু রাজা রামমোহনের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য দেখাইবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের মুষ্টিমেয় সভ্যগণের মধ্যে দলাদলি, মনোমালিন্য এবং বিদ্বেষের সৃষ্টি করিতেছি। 'বিগত-বিবাদের' প্রেমময় রাজ্যে ঘোর বিবাদ উৎপন্ন করিতেছি! ইহাই যেন আজকাল আমাদের সাধনার প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এমন কি, আমরা এই শতবাৎসরিক শুভ উৎসব উপলক্ষেও আপনাদিগকে সংযত রাখিতে পারি নাই। যে ব্রাহ্মসমাজের প্রধান উদ্দেশ্য সকল সম্প্রদায়ের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া ব্রাহ্মসমাজের মিলন-মন্ত্রে সকলকে একসূত্রে গ্রথিত করা, আজ সেই ব্রাহ্মসমাজ আপন সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃগণের মধ্যে পরস্পরে বিরোধ উপস্থিত করিয়া সমাজের যে কতদূর ক্ষতি করিতেছেন, তাহা ভাবিলে কাহার না প্রাণ ব্যথিত হয়; এরূপ স্থলে ব্রাহ্মসমাজের পতন যে অবশ্যম্ভাবী তাহাও কি বলিয়া দিতে হইবে?

বলা বাহুল্য যে ব্রাহ্ম-সমাজকে পূর্ব্ব আদর্শে ফিরাইয়া আনিতে হইলে তিন শাখার সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। সকল শাখার সমবেত সাধনা-শক্তির উপরেই ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছে। সমাজের মধ্যে যাহা কিছু আবর্জ্জনা আসিয়া পড়িয়াছে তাহাকে দূর করিতে হইলে সকল শাখার সমবেত শক্তিপ্রয়োগ প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে যে তিনটি শাখা লইয়াই ব্রাহ্মসমাজ। একের মানে অপরের মান, একের নিন্দায় অপরের নিন্দা, একের পতনে অপরের পতন অবশ্যম্ভাবী। যেমন শরীরের এক অংশে দুষ্ট ক্ষত হইলে অপর অংশেরও হানি করে, সেইরূপ একশাখার অবনতিতে অপর শাখারও অবনতি হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এক শাখার পদস্খলন হইলে অপর শাখাও যে তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, এক শাখার গ্লানি উপস্থিত হইলে উহা অপর শাখাতেও যে সংক্রামিত হইবে, ইহা অস্বীকার

করা যায় না। আমাদের নিকটে এবিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্ত্তমান।

আমরা স্বীকার করি বা না করি, ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা যে ক্রমেই শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতেছে, ইহা একটি প্রকৃত সত্য। ব্রাহ্মসমাজকে এই মুমূর্ষু অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য এখনও বিশেষ চেষ্টা না করিলে অচিরে রাজা রামমোহন প্রতিষ্ঠিত সাধনার এই বৃহৎ অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। এই নিমিত্ত আমি প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী ব্যক্তিকে এবিষয়ে একটু চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

আমার মতে যত শীঘ্র সম্ভব এজন্য ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার বিশিষ্ট সভ্যগণকে লইয়া একটি সংস্কার-সভা গঠিত করা আবশ্যক। এই সভায় যোগদান করিতে যাহাতে কাহারও আপত্তি না থাকিতে পারে সেজন্য একটি স্বতন্ত্র স্থানে ইহার বৈঠকের বন্দোবস্ত করা উচিত। আগামী মাঘোৎসবের সময় অনেক ব্রাহ্ম মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় আসিবেন; সুতরাং মাঘোৎসবের একদিন এজন্য নির্দ্দিষ্ট করিলে বড় ভাল হয়। কি উপায়ে সমাজকে অবনতির স্রোত হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে, উক্ত সভায় তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তৎপরে তদনুরূপ প্রচারকার্য্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথমে আমাদের নিজের সামাজিক ব্যাধির চিকিৎসা করা আবশ্যক। নিজেদের মধ্যে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়া অপরের সমাজের সংশোধন করিতে চেষ্টা করিতে গেলে কোন সুফল হইবে না। তৎপরে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ সাধনা, ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ নীতি, ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ চরিত্র, ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ প্রেম ও মৈত্রীভাব,—প্রত্যেক ব্রাহ্ম নরনারীর হৃদয়ে প্রস্ফুটিত করিয়া দিতে হইবে; প্রত্যেক ব্রাহ্ম পরিবারে ব্রহ্মনিষ্ঠার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মগৃহকে পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে পরিণত করিতে হইবে। এবম্বিধ প্রকারে অতি অল্পদিন মধ্যে আবার আমাদের ব্রাহ্মসমাজ সকল দেশের আদর্শস্থানীয় হইয়া উঠিবে।

এই সকল কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য অতি সুলভ মূল্যের একখানি অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মপত্রিকার আবশ্যক। এই পত্রিকার দ্বারা আমরা প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজের এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মপরিবারের মধ্যে প্রচারকার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিব। *

---

* বন্ধুবর সদানন্দজী ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার উদ্দেশ্যে তাঁহার যথাশক্তি কিপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন, আমরা "নানা কথায়" তাহা প্রকাশ করিলাম। তঃ পঃ সঃ

জয়পরাজয়।

ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, লাভলোকসানে, জয়-পরাজয়ে মানুষের সমবুদ্ধি থাকা উচিত—এই প্রকার দ্বন্দ্বের কোনও একটীতে ঢলিয়া পড়া উচিত নয়। শত্রুগণের উপর জয়লাভ করিলাম, অতএব উন্মত্তের ন্যায় আমাকে নৃত্য করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই; অথবা আমার পরাজয় হইল, অতএব আমাকে মুহ্যমান হইয়া কেবলই হাহুতাশ করিতে হইবে, এমনও কোনও কথা নাই। সমবুদ্ধি থাকাই যে জয়ের লক্ষণ ও কারণ তাহা অনেকের মনে আসে না। দ্বন্দ্ব-কোলাহলের মধ্যে সমবুদ্ধি হইয়া থাকার ফলে যে দৃঢ়তা আসে, যে ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য আসে, তাহাই তো আমাদিগকে জয়ের পথে না লইয়া থাকিতে পারে না।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বৈষয়িক ব্যাপারের ন্যায় আধ্যাত্মিক রাজ্যেও অনেকেই পরাজয়ের আঘাত সহ্য করিতে পারে না। অধিকাংশ পরাজিত ব্যক্তিই নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। তাহারা পরাজয়ের কারণ সন্ধানে অগ্রসর হইতে চায় না। তাহাদের মনের সে বল নাই, সে ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য নাই। রাজনৈতিক জগতেও যেমন অনেক "settled facts" বা অটল বলিয়া গৃহীত ঘটনাকেও unsettled বা টলিয়া যাইতে দেখি, তখন অধ্যাত্মরাজ্যেই বা সকল বিষয়ই অটল থাকিবে কেন? আমরা দেখি, অধ্যাত্মরাজ্য বিশেষ ভাবে উন্নতির রাজ্য—সেখানে অটল বা অচলায়তনরূপে পড়িয়া থাকিবার কোন কিছু থাকিতে পারে না।

যাহারা পরাজয়ের কারণে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে চায়, পরাজয়ের সহিত সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইয়া থাকিতে চায়, আসলে তাহাদের চরিত্রবল বড়ই অল্প—চরিত্র বিষয়ে তাহাদিগকে "কোমরভাঙ্গা" বলা যাইতে পারে; তাহারা একটুতেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহাদের বিচারশক্তিও বড়ই কম। তাহারা জীবনের প্রারম্ভে হাসিতে হাসিতে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় বটে, তখন সমস্ত জগৎই আনন্দের তরঙ্গে তরঙ্গিত দেখে; কিন্তু প্রথম হোঁচটেই তাহারা একবার যখন পড়িয়া যায়, তখন আর তাহা হইতে উঠিতে পারে না—তাহাদের সম্মুখের আনন্দের ছবি খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যায়। প্রথম ঝড় খাইতে না খাইতেই তাহারা কূলকিনারা হারাইয়া ফেলে—দিশাহারা হইয়া পড়ে।

জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র যে দ্বন্দ্ববিবাদের ক্ষেত্র; বলিতে কি, দ্বন্দ্ববিবাদেই যে আমাদের জীবন নির্ভর করে, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে অনেকেই সে কথা স্মরণ করে না। জগতে লাভ লোকসান না থাকিলে উত্থান পতন না থাকিলে জীবনের পরিচয় পাইতাম কোথায়?

এখানে আছুরেপনার অবসর নাই, কাঁদিবার স্থান নাই। কাঁদ, পশ্চাতে পড়িয়া থাক—তোমার দিকে খুবই সম্ভব কেহই একবার ফিরিয়াও তাকাইবে না, বরঞ্চ তোমার বুকের উপর চড়িয়া অন্যেরা নিজেদের উন্নতির আশায় ছুটিয়া চলিবে। “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ” ভগবানকে বলহীন ব্যক্তি লাভ করিতে পারে না—অধ্যাত্মরাজ্যের ইহা একটী মহান সত্য।

মনে রাখিতে হইবে যে, আধ্যাত্মিক উন্নতি বা ভগবানের চরণে অগ্রসর হওয়া কেবল পুঁথিগত বিদ্যার উপরেও নির্ভর করে না বা মেধার উপরেও নির্ভর করে না বা কেবলমাত্র লোকাচার দেশাচার প্রভৃতি প্রতি-পালনের উপরেও নির্ভর করে না। যে সাধক সত্য-সত্য ভগবানকে প্রার্থনা করেন, যিনি টেঁক ধরিয়া বসেন যে, তিনি ভগবান ব্যতীত আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবেন না, নচিকেতার ন্যায় যিনি ভগবানের জন্য সর্ব্বস্ব—জীবন পর্য্যন্ত পণ করিতে পারিবেন, তিনিই ভগবানকে নিশ্চয়ই লাভ করিবেন—নিশ্চয়ই লাভ করিবেন—নিশ্চয়ই লাভ করিবেন।

অধ্যাত্মরাজ্যে যিনি নেতৃত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহাকে দেখাইতে হইবে যে তিনি ক্ষণভঙ্গুর নন—একটুখানি প্রশংসাতেও তিনি মাতোয়ারা হন না, আর একটুখানি নিন্দাতেও তিনি অধীর হইয়া পড়েন না। প্রশংসার মাঝেও যেমন তাঁহাকে অটল—অচল থাকিতে হইবে, নিন্দার অগ্নিবর্ষণের মধ্যেও তাঁহাকে তেমনই অটল-অচল ধীর-স্থির থাকিতে হইবে। সত্য বলিয়া যাহা বুঝিবেন, তাহার সমর্থনের জন্য তাঁহাকে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে হইবে।

আধ্যাত্মরাজ্যে যে ব্যক্তি অগ্রসর হইতে চাহিবেন, তাঁহাকে জানিয়া রাখিতে হইবে যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যাত্রীগণ ঐ পথ অনেক স্থলে পদাঙ্কিত করিলেও সকল স্থল পদাঙ্কিত করেন নাই, কারণ অনন্তস্বরূপ ভগবানের অনন্ত রাজ্যের প্রত্যেক স্থল কোন একজনের পক্ষে মাড়া-ইয়া চলা সম্ভব নহে। সুতরাং প্রত্যেক অমৃতধামযাত্রীর জন্য অজানা কিছু না কিছু স্থান থাকিবেই—সেইটুকু তাঁহাকে নিজের দেখিয়া শুনিয়া চলিতে হইবে। সেইটুকু অজানা পথে চলিবার সময়েই তাঁহাকে জানিতে হইবে যে উত্থান ও পতন অবশ্যম্ভাবী। উত্থান হইলেও গর্ব্বে অহঙ্কারে সেই একই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলে চলিবে না; পতন হইলেও নিরাশায় নিরানন্দে সেই একই স্থানে দাঁড়াইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কাঁদিতে বসিলে চলিবে না। উত্থান পতনের ভিতর দিয়া, জয়পরাজয়ের ভিতর দিয়া আমাদিগকে আধ্যাত্মরাজ্যের শিখরদেশে উঠিতে হইবে, ভগবানের সিংহাসনের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। জানিবে, উত্থানপতনই, জয়পরাজয়ই আমাদের উন্নতির সুপ্রশস্ত সোপান, আমাদের কল্যাণ লাভের অমোঘ উপায়।

পার্থিব ব্যাপারেও যেমন, আধ্যাত্মিক রাজ্যেও সেইরূপ—নিজের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে প্রতিজ্ঞা করিয়া নামিতে হইবে যে, শত পরাজয়েও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিব না। জগতের সর্ব্বত্র, সমস্ত প্রকৃতিরাজ্যেই দ্বন্দ্ববিবাদ বিচরণ করিতেছে। প্রকৃতি যে সীমাবদ্ধ, প্রকৃতির অণুপরমাণু যে সীমাবদ্ধ; কাজেই প্রকৃতি দ্বন্দ্ববিবাদের হাত কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারে না; সেখানে দ্বন্দ্বই হইল নিয়ম—শীত আছে, গরম আছে; উত্থান আছে, পতন আছে; সুখ আছে, দুঃখ আছে। কি জয়ে, কি পরাজয়ে, আমাদের যে অভিজ্ঞতা হইবে, সেই অভিজ্ঞতার বলে উন্নতির পথে, মঙ্গলের পথে, শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হওয়াই হইল বীরের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। বৈজ্ঞানিকের ন্যায় প্রত্যেক সাধক তাঁহার পতন বা পরাজয়কে তাঁহার সাধনপথের অন্যতর দীপ বলিয়া গ্রহণ করিবেন। জীবনবেদে পরাজয়ের কারণগুলি পরিষ্কাররূপে লিখিয়া রাখিয়া, গন্তব্যপথে অগ্রসর হইবার কালে সম্মুখে সেই প্রকার কোন কারণের আবির্ভাব দেখিলে তাহাকে পাশ কাটাইয়া চলিবেন। আমরা অধিকাংশ স্থলেই দেখি যে, অধিকাংশ সাধনেচ্ছু ব্যক্তি পরাজয়ের বিভী-ষিকাতেই জীবন্মৃত হইয়া পড়েন এবং গন্তব্য পথে অগ্রসর হইবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলেন। বিভীষিকায় ভীত হইও না—নিদ্রা ও আলস্যে দিন কাটাইও না; উন্নতি ও মঙ্গল নিশ্চয়ই তোমার হস্তগত হইবে। “সাধু যাঁহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাঁহার সহায়।”

সঙ্ঘের অঙ্কুরোদ্গম।

(শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ)

শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা। * তাপস গৌতম আজ “বুদ্ধ” হইলেন—‘সম্বোধি’ লাভ করিয়া তিনি প্রবুদ্ধ হইলেন। দেখিতে দেখিতে উনপঞ্চাশৎ দিবস কাটিয়া গেল, নবীন বুদ্ধ আহার নিদ্রাহীন; কেবল আনন্দ, আনন্দ—সমাধি সম্ভোগ। পঞ্চাশৎ দিবসে ধীরে ধীরে চিত্ত নিম্নতর স্তরে অবরোহণ করিল। তাঁহার কিঞ্চিৎ আহার্য্য গ্রহণের অভিলাষ জন্মিল।

এই সময় ত্রপুষ (তপুস্‌স) ও ভল্লিক (ভল্লুক) নামক দুই বণিক্ ভ্রাতা বাণিজ্যোদ্দেশ্যে নিকটবর্ত্তী পথে উৎকল

---

* বৌদ্ধ মতে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধের জন্ম, গৃহত্যাগ ও সম্বোধিলাভ ঘটিয়াছিল। কেহ কেহ ঐ তিথিকে মায়াদেবীর গর্ভসঞ্চার যুওং বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের সহিতও যুক্তকরিয়াছেন।

হইতে মধ্যদেশে যাইতে ছিল। বুদ্ধকে আহার্য্য দান করিতে তাহাদের প্রতি দেবাদেশ হইল। দুই ভ্রাতা বুদ্ধসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বহু উপাদেয় খাদ্য-সামগ্রী নিবেদন করিল। বুদ্ধ আহার্য্য গ্রহণ করিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার শরণ লইল। যথাসময়ে তাহারা স্মারক চিহ্নস্বরূপ বুদ্ধের একগুচ্ছ কেশ লইয়া গম্য স্থানাভিমুখে গমন করিল।

বুদ্ধ ভাবিতে লাগিলেন, "নির্ব্বাণ লাভ করিলাম। কিন্তু জগতে লব্ধ সত্যের প্রচার হইবে কি? অল্পবুদ্ধি মর্ত্ত্য মানব এ গভীর সত্য বুঝিবে কি?" প্রচারকার্য্যের সফলতা বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইতে না পারিয়া তিনি সমাধিসাগরে ডুবিয়া নিয়ত নির্ব্বাণ-সুখ সম্ভোগ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। তাঁহার এই সঙ্কল্পে ভীত হইয়া সহম্পাতি ব্রহ্মা তৎসমীপে আবির্ভূত হইয়া কর-যোড়ে * এই মহদ্ধর্ম্ম প্রচার করিতে মিনতি জানাইলেন। ব্রহ্মার কাতর অনুনয়ে তথাগতের অন্তরে করুণা সঞ্চার হইল। তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর তিনি এই ধর্ম্মপ্রচারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে ইহা সহজে লোকের বোধগম্য হইবে, তাঁহার অন্তরে বিতর্ক উপস্থিত হইল। সহসা ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তী বোধিসত্ত্ব তথায় আবির্ভূত হই-লেন। বোধিসত্ত্ব শ্রীবুদ্ধকে একটি অলঙ্কারমণ্ডিত চক্র প্রদর্শন করিলেন। শ্রীবুদ্ধ বুঝিলেন, গতিহীন ধর্ম্ম-চক্রকে গতি প্রদান করিতে হইবে, ইহাই বোধিসত্ত্ব-প্রদর্শিত ইঙ্গিতের অর্থ।

সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণের প্রত্যেকের অন্তরেই এইরূপ দ্বিধা উপস্থিত হইয়া থাকে। যুগপ্রবর্ত্তক কালধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ প্রভাব অতিক্রম করিয়া সত্যারূঢ় হইয়া ভাবেন, মানবসাধারণ চিরাচরিত প্রথানুসারে আজিও নিশ্চিন্ত-চিত্তে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, সুপ্তির ঘোরে এখনও তাহারা লুপ্তচেতন—এই সুপ্তির জাল ছিন্ন করিয়া যুগবাণী তাহাদের মর্ম্মে প্রবেশ করিবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? বুদ্ধের মনে এইরূপ সন্দেহের উদয় হইল, তিনি স্থির করিলেন সমাধিমগ্ন হইয়া থাকিবেন,— অন্তর যাঁহার অমৃতালোকে উদ্ভাসিত বহির্জ্জগতের সুখ-দুঃখে, সত্যাসত্যে তাঁহার কি আসে যায়? কিন্তু যে মহাপ্রাণ জগতের দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া জগতেরই জন্য শিবত্বের অনুসন্ধানে যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, কেবলমাত্র আত্মমুক্তি লইয়া তিনি কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিবেন? †

দ্বিধা অতিক্রম করিয়া তথাগত * কাহার নিকট নবলব্ধ জ্ঞান প্রথম প্রচার করিবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন। আচার্য্য আলারকালাম ও উদ্রকের কথা তাঁহার মনে পড়িল, কিন্তু ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন উভয়েরই দেহান্ত হইয়াছে। তাঁহারা জীবিত নাই জানিয়া তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন। অতঃপর উরুবেলা গ্রামে যে পঞ্চজন তাপস তাঁহার ষট্‌বর্ষব্যাপী তপস্যার সহায় হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা তাঁহার মনে উদয় হইল। ধ্যানস্থ হইয়া তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁহারা তৎকালে বারাণসীধামে ঋষি-পত্তন-মৃগদাবে তপশ্চরণে নিযুক্ত আছেন। বুদ্ধ বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পথে আজীবক উপকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। উপকের ধারণা হইল এই তেজঃপুঞ্জ মহাপুরুষ নিশ্চয়ই কোন দেবতা। গৌতম-বুদ্ধ তাঁহার ভ্রম দূর করিয়া স্বপথে অগ্রসর হইলেন। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঋষি-পত্তনে উপনীত হইলেন।

পঞ্চ-ভিক্ষু দূর হইতেই গৌতমকে লক্ষ্য করিয়া পর-স্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—'শ্রমণ গৌতম কঠোর তপশ্চর্য্যা পরিত্যাগ করিয়া সহজ জীবনযাত্রার পথ অব-লম্বন করিয়াছেন; তাঁহাকে আমরা অভ্যর্থনা করিব না, তবে উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া একখানি বসিবার আসন দিব।' বুদ্ধ তাঁহাদের ভাব লক্ষ্য করি-লেন। তাঁহার স্নিগ্ধদৃষ্টির মোহনীয় আকর্ষণে কিন্তু ভিক্ষুগণ স্থির থাকিতে পারিলেন না—তাঁহারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে ভ্রাতৃসম্বোধনে কুশল প্রশ্ন করিলেন। তাঁহাদের অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া বুদ্ধ কহিলেন—"ভিক্ষুগণ, এভাবে আর আমায় সম্বোধন করিও না। আমি এখন তথাগত। আমি তোমাদের নিকট এখনই এরূপ 'ধর্ম্ম' বিবৃত করিব, যাহাতে তোমরা এই জন্মেই পরমপদ লাভ

---

* নির্ব্বাণপ্রাপ্ত জীবন্মুক্ত পুরুষ দেবগণ অপেক্ষাও উন্নত—বৌদ্ধমতে তাঁহারাই ত্রিলোকে শ্রেষ্ঠ জীব।

† cf It is impossible to withdraw from the world, and associate with birds and beasts that have no affinity with us. With whom should I associate but with suffering men ?—Confucius.

জগতের দুঃখ-তাপ হৃদয়বান ব্যক্তিমাত্রকেই ব্যস্ত করিয়া তুলে। মানবের ঔদাসীন্য-উপহাস তাঁহাকে কখনো কখনো কর্ম্মবিমুখ করিয়া তুলে বটে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সেই মানবের দুঃখেই তিনি বিচলিত হইয়া পড়েন। বুদ্ধেরও ক্ষণকালের জন্য ধর্ম্মপ্রচারে অনিচ্ছা জন্মিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অন্তর্নিহিত কল্যাণেচ্ছা তাঁহাকে স্থির থাকিতে দেয় নাই। এই কল্যাণেচ্ছাই কবি কর্ত্তৃক ব্রহ্মারূপে এবং তৎকালীন সমাজের ধর্ম্মলাভের ব্যগ্রতাই বোধি-সত্ত্বরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে।

* যিনি তথাগত হইয়াছেন অর্থাৎ যিনি নির্ব্বাণপদ লাভ করিয়াছেন। অপর মতে যিনি 'তথা' অর্থাৎ সেইপ্রকারে অর্থাৎ পূর্ব্বগামী আচার্য্যগণের পন্থানুযায়ী 'গত' অর্থাৎ বুদ্ধত্বে গমন করিয়াছেন। নিজের উল্লেখ কালে বুদ্ধ সর্ব্বদা এই নামই ব্যবহার করিতেন।

করিবে।"* বুদ্ধ সকলকে এই মহাসত্য ধারণার্থে অবহিত হইতে অনুরোধ করিলেন। বুদ্ধের এই আহ্বান শুনিয়া তাঁহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া স্থির হইয়া বসিলেন। সমগ্র বিশ্বচরাচর উৎকর্ণ হইয়া রহিল। বিমানে অদৃশ্য দেবগণের স্থানসঙ্কুলান কষ্টকর হইল। বুদ্ধ শান্ত সংযত কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"হে ভিক্ষুগণ, প্রব্রজিতের (সংসারত্যাগীর) দুইটি চরম পন্থা পরিহার্য্য। প্রথম—ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগ, বিশেষতঃ কামপরায়ণতা। ইহা অধার্ম্মিক, অলাভকর, হীন এবং সংসারাসক্তেরই উপযুক্ত। দ্বিতীয়তঃ—কষ্টদায়ক কঠোর তপশ্চর্য্যা। ইহাতেও বিশেষ লাভ নাই, কোন স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না।

"ভিক্ষুগণ! একটি মধ্যপন্থা আছে, যাহাতে এই উভয় চরমই পরিহার করা বলে। তথাগত এই পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পন্থা সকলের নেত্র উন্মীলিত করিবে এবং সকলকে সত্যাসত্য ধারণার ক্ষমতা দিবে; এই পন্থা মনে শান্তিদান করিবে; সকলকে অন্তর্দৃষ্টি, দিব্যজ্ঞান দিয়া নির্ব্বাণরাজ্যে পৌঁছাইয়া দিবে।

"এই মধ্যপন্থা কি?—আষ্টাঙ্গিক মার্গঃ—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যগ্ ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি।

"হে ভিক্ষুগণ, এখন দুঃখ সম্বন্ধে আর্য্যসত্য শ্রবণ কর। জন্ম দুঃখময়, জরা দুঃখময়; দুঃখময় রোগ, মৃত্যুও দুঃখময়। অপ্রিয়-মিলনে দুঃখ, প্রিয়বিচ্ছেদেও দুঃখ; কোন ইচ্ছার অপূরণ, সেও দুঃখময়। * * *

"ভিক্ষুগণ, দুঃখসমুদয় (উৎপত্তি) সম্বন্ধে আর্য্যসত্য এই:—অদম্য তৃষ্ণাই এই দুঃখের মূলে বিদ্যমান। এই তৃষ্ণাই মানবকে জন্ম জন্ম ঘুরাইয়া থাকে। তৃষ্ণাই মানবকে ইন্দ্রিয়ভোগের পথে লইয়া যায় এবং কখনও এখানে কখনও সেখানে আপন চরিতার্থতা খুঁজিয়া বেড়ায়। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, নবজন্মের আশা, ইহজন্মে উচ্চ পদের আকাঙ্ক্ষা—এ সকলেরই মূলে তৃষ্ণা।

"প্রিয় ভিক্ষুগণ, এইবারে দুঃখ-নিরোধ সম্বন্ধে আর্য্য সত্য শ্রবণ কর। তৃষ্ণার একান্ত নাশই দুঃখ-নিরোধ। তৃষ্ণাকে সর্ব্বথা পরিহার, তৃষ্ণার হস্ত হইতে মুক্তি, তৃষ্ণাকে কোনক্রমে প্রশ্রয় না দেওয়া—এইরূপেই দুঃখ নিরোধ হইতে পারে।

"সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব; সম্যগ্‌ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি—এই আর্য্যাষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখ-নিরোধের একমাত্র পন্থা।" *

উপদেশ শুনিতে শুনিতেই কৌণ্ডিন্য স্রোতাপত্তি ফল † লাভ করিলেন। অন্যান্য ভিক্ষুগণের ঐ অবস্থা লাভ করিতে আরও চারিদিন সময় লাগিল। পঞ্চম দিবসে বুদ্ধ স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা ও রূপস্কন্ধাদির † অনাত্মতা প্রমাণ করিয়া এক জ্ঞানগর্ভ উপদেশবাণী প্রচার করিলেন। ফলে পাঁচজন ভিক্ষু একই দিনে অর্হৎ † পদবী লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইলেন।

বুদ্ধ তখন ঋষিপত্তনে অবস্থান করিতেছেন, ইতিমধ্যে যশ নামক জনৈক শ্রেষ্ঠীপুত্রের স্বপ্নে কতকগুলি স্ত্রীলোকের বীভৎসরূপ দেখিয়া সংসারে অশ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া মৃগদাবে বুদ্ধসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অধিকারী বোধে বুদ্ধ তৎসমীপে 'ধর্ম্ম' ব্যাখ্যা করিলেন। যশও অর্হত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইলেন।

যশের চুয়ান্নজন বন্ধু তাঁহাকে সংসারে ফিরাইয়া লইতে আসিলেন। কিন্তু যশের দিব্যকান্তি-যুক্ত মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহারা এককালে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহাদের আর সংসারে ফিরিয়া যাইতে প্রবৃত্তি হইল না। তথাগতের ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহারাও সকলে অর্হত্ব লাভ করিলেন। এইভাবে অর্হৎসংখ্যা সর্ব্বসমেত একষষ্টি হইল—সঙ্ঘের অঙ্কুরোদ্ভব হইল।

যশের পিতাও ক্রমে বুদ্ধের রূপে গুণে আকৃষ্ট হইলেন। তিনিও আসিয়া বুদ্ধের শরণলাভের আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। উপাসক (গৃহীভক্ত) শ্রেণীর জন্য বুদ্ধ ত্রিশরণ-মন্ত্র ‡ রচনা করিলেন। এই মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া যশের পিতা প্রথম বৌদ্ধ উপাসক হইলেন। ক্রমে যশের মাতা এবং পত্নীও এই মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া উপাসিকা সম্প্রদায়ের জন্মদান করিলেন।

তথাগত অতঃপর অনুচর শিষ্যগণকে একত্রিত করিয়া আদেশ করিলেন,—"হে ভিক্ষুগণ, দেশে দেশে গমন কর, "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" দিকে দিকে পরিভ্রমণ কর, অনুকম্পায় তোমাদের হৃদয় দ্রবীভূত হউক; প্রত্যেকে বিভিন্ন দিকে গমন কর; ভাবে ভাষায় আনন্দদায়ক এই সঞ্জীবনী 'ধর্ম্ম'-প্রচারে জীবনপাত কর। সকলের সম্মুখে নিখুঁত পবিত্র জীবনের আদর্শ

* বুদ্ধের সহজ সরল ভাব এই কয়টি কথাতেই সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবতাকে অবজ্ঞা করিয়া অনাবশ্যক বিনয়-নম্রতার আলঙ্কারিক আড়ম্বর তিনি পছন্দ করিতেন না। কাজেই প্রবর্দ্ধি সাধকগণ যাহাতে 'তথাগত'কে 'ভ্রাতা' সম্বোধন না করেন, তৎপ্রতি তাঁহাদিগকে অবহিত করিয়া দিলেন।

* বুদ্ধের এই প্রথম উপদেশকে "ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনসূত্র" বলে। ভারতের যে ধর্ম্মচক্র কালবশে গতি হারাইয়া অচলভাবে দাঁড়াইয়াছিল, বুদ্ধ তাহাতে পুনঃ গতি দান করেন। সেইজন্য তাঁহার সচেষ্টাকে 'ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন' বলে।

† পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

‡ অহং বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, অহং ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি অহং সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

ধর। নেত্রাবরণ প্রায় খসিয়া গিয়াছে, এমন মানব অনেক আছে; পবিত্র 'ধর্ম্মের' সন্ধান তাহাদিগকে না দিলে তাহারা মুক্তি পাইবে না। তাহারা নিশ্চয়ই ইহা গ্রহণ করিবে। চল, ভিক্ষুগণ! আমিও প্রচারোদ্দেশ্যে উরুবেলা-সেনিয়গামে যাইব।"

বুদ্ধ উরুবেলা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে মার আবার তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার বৃথা চেষ্টা করিল। অনেক পথ হাঁটিয়া তিনি বিশ্রামার্থ এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। নিকটবর্ত্তী গ্রামে ত্রাত্রিংশজ্জন ভ্রাতা মগধরাজের অধীনে একযোগে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহারা ঠিক এই সময়ে এক পলায়িতা রক্ষিতার অনুসন্ধানে ঐ বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বুদ্ধকে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। বুদ্ধ কহিলেন, "অন্যকে অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে আপনার সন্ধান লওয়া উচিত নয় কি?" শান্ত যতির গুরু গম্ভীর বাণী ভ্রাতৃগণের অন্তস্তল স্পর্শ করিল। মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহারা বুদ্ধের শরণ প্রার্থনা করিলেন। তথাগতের উপদেশে তাঁহাদেরও অর্হত্ব লাভ হইল। বুদ্ধ তাঁহাদিগকে সদ্ধর্ম্মপ্রচারার্থে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং উরুবেলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

আর্য্যজাতি ও আর্য্যধর্ম্ম।

(৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(২)

শ্রৌতসূত্র।

সূত্রসাহিত্য সর্ব্বতোভাবে যে ব্রাহ্মণের উপরেই রহিয়াছে তাহা নয়। ব্রাহ্মণে যাগযজ্ঞ সম্বন্ধেই বাহুল্যে উল্লেখ আছে। এই যাগযজ্ঞ ঘটিত যে সকল সূত্র প্রস্তুত হইয়াছে তাহাকে বিশেষরূপে শ্রৌতসূত্র বলে, যেহেতু শ্রুতির উপরেই তাহার সমস্ত নির্ভর। শ্রৌতসূত্রের আর একটী নাম কল্পসূত্র। অন্যান্য সূত্রের নাম যদিও মূল শ্রুতিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহারা স্বতন্ত্র আলোচনার ফল।

গৃহ্যসূত্র

এই শ্রৌতসূত্রের পাশাপাশি আমরা আর এক শ্রেণীর আনুষ্ঠানিক (ritual) সূত্র দেখিতে পাই,—ইহাকে গৃহ্যসূত্র বলে। ইহাতে সব ঘরাও অনুষ্ঠানের বিষয় বিবৃত আছে। যেমন গর্ভাধান, জন্মেষ্টি, উপনয়ন, বিবাহ অন্ত্যেষ্টি, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি। যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইল সামাজিক অনুষ্ঠান, ইহা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ঋষিদলের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হইত। কল্পসূত্রে সেই সকলের উল্লেখ আছে। গৃহকর্ম্মের অনুষ্ঠানটি পারিবারিক অনুষ্ঠান; ইহার দ্বারা প্রতি পরিবারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হইত। ইহা পরিবারের হিতোদ্দেশে করা হইল। আমাদের মধ্যে ত এখন গৃহ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান লইয়া পরিবারদিগের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন হয় না, উল্টা দলাদলি বাড়ে।

যেমন কল্পসূত্রের আর একটা নাম শ্রৌতসূত্র, তেমনি গৃহ্যসূত্রের নাম হইতেছে স্মার্ত্তসূত্র অর্থাৎ যে সূত্র স্মৃতির কিম্বা স্মরণের উপরে নিশ্চিত।

যজ্ঞ ও গৃহকর্ম্ম, শ্রুতি-স্মৃতি।

সামাজিক আড়ম্বরপূর্ণ যাগযজ্ঞের শিক্ষা গুরূপদেশের উপর নির্ভর করে। মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহাতে মহা আড়ম্বরের ভাবটা উদয় হয় যাগযজ্ঞের কার্য্যটাকে এমন করিয়া সম্পন্ন করা চাই। যাগযজ্ঞে দক্ষ বিশেষ বিশেষ ঋষি, যাঁহারা মনুষ্যের মনে ঐরূপ ভাব উৎপন্ন করিতে কুশল, তাঁহাদিগের আলোচনা ও উদ্ভাবনা (speculation and suggestion) দ্বারা যাগযজ্ঞসমুদয় পারিপাটি শৃঙ্খলায় আবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে লোকের মনে যজ্ঞের পবিত্র ভাব ও মহদ্ভাব আসে। যদিও যাগযজ্ঞ প্রথমে আর্য্যদিগের মধ্যে সাধারণ ভাব ছিল, কিন্তু পরে আড়ম্বর বেশী বেশী হওয়াতে উহা শিক্ষিত কতক লোকেরই আয়ত্তের বিষয় হইল, সুতরাং তাহাদের কাছ হইতে শুনিয়া শুনিয়া শিখিতে হইত। গৃহকর্ম্ম ত সেরূপ নয়, এটা যেন সকলেরই আয়ত্তাধীন। ইহা শৈশব হইতে আপনাদের গৃহ্যঅনুষ্ঠান দেখিতে দেখিতে স্মৃতিতে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া যাইত। ইহা শিখিবার জন্য কোন একটা উপায় অবলম্বন করিতে হইত না। দেখিতে দেখিতেই হইয়া যাইত, ইহা যেন গৃহস্থমাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি ছিল, ব্যবহার করিলেই হয়। ইহাতে শ্রুতি আবশ্যক নাই, কেবল স্মৃতি আবশ্যক। যাগযজ্ঞ যেমন অল্পসংখ্যক শিক্ষিতদিগের ধন, আচারব্যবহার তেমনি সাধারণ সম্পত্তি, সকলেরই পক্ষে সুগম।

তাই বলিয়া যে স্মৃতি অর্থাৎ আচারব্যবহারের কালক্রমে পরিবর্ত্তন হয় নাই তাহা নয়। আর্য্যেরা যখন আদিমবাসীদিগকে বশে আনিয়া আপনাদিগের উপনিবেশ স্থাপনে রত হইল, তাহাদিগের হস্তে তখন এত কর্ম্ম হইল যে, তখন তাহাদের অন্য কিছু দেখিবার আর অবকাশ রহিল না; শত্রুদিগের হইতে আপনাদিগের অধিকার রক্ষা করিতেই তাহাদিগের সকল উদ্যম পর্য্যস্ত হইল। এইরূপে একে একে যখন সকল বাধা অতিক্রম করিল, তখন তাহারা জাগ্রত হইয়া দেখিল, যে আর এক প্রবলতর শত্রুর হস্তে তাহারা আপনারা হাত-পা-বাঁধা হইয়া পড়িয়াছে। অথবা তাহারা জাগ্রত হইতে আর পারিল

না। মানসিক চালনার হানি করিয়া তাহাদিগের শারীরিক বল-বীর্য্য এত পরিমাণে চালিত ও ব্যয়িত হইয়াছিল যে, তাহাদিগের মানসিক শক্তি (intellectual energy) একেবারে শুকাইয়া গিয়াছিল। এই যে নূতন প্রবলতর শক্র তাহার বিবরণ এই :--

ব্রাহ্মণের উৎপত্তি।

যে সকল গান দ্বারা আর্য্যেরা সিন্ধুনদী-তীরে আপনাদিগের পুরাতর বাসস্থানে প্রকৃতির মাহাত্ম্য পূজা করিত এবং সেই গানের সহিত যেরূপ বিধানে কর্ম্ম সম্পন্ন করিত, এই উভয়ই ক্রমে সেই সেই বংশে রহিয়া গেল—হয়ত যাহারা উহার রচয়িতা অথবা যে বংশে কুলপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছিল—সেই সেই পরিবারের মধ্যে সেই সব প্রবাদও প্রচলিত রহিল, যাহা দ্বারা ঐ সকল করণ-কারণ বুঝাইতে পারা যায় ; তাহারা জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ড উভয়েরই অধিকারী হইয়া রহিল। এখন বিদেশে স্বদেশের বার্ত্তা যাহা কিছু আনীত হয়, তাহাই শ্রদ্ধার ভাবে পূর্ণ, তাহাই আন্তরিক সমাদরে গৃহীত হয়। এইরূপে এই সকল গায়কবংশেরা পুরোহিত-বংশ হইয়া পড়িল ; যত দিন যাইতে লাগিল, পূর্ব্বকার আবাসভূমি হইতে আর্য্যেরা যত দূরে প্রস্থত হইয়া পড়িতে লাগিল, এবং বাহিরের লড়াই-হাঙ্গামায় যত তাহারা মত্ত হইয়া আপনাদিগের পুরাতন আচার-প্রথা ভুলিয়া যাইতে লাগিল, ততই তাহাদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল হইতে লাগিল। পুরাতন আচার পুরাতন পূজাপ্রণালী রক্ষা করা সকলেরই অত্যন্ত যত্নের ধন হইল। এবং অনন্যকর্ম্মা হইয়া সেই সকল যাহারা রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল তাহারা সেই সকলের প্রতিভূস্বরূপ হইল এবং অবশেষে তাহারা দেবতাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া ভূদেবতা হইল। রাজন্যেরা হইলেন ভূপতি, ব্রাহ্মণেরা হইলেন ভূদেবতা। তাহারা আপনাদিগের সুবিধাকে এমন দৃঢ়বদ্ধ করিল যে পুরোহিতসাধারণের কর্তৃত্ব এমন কেহ কোথাও দেখে নাই, আজও পর্য্যন্ত তাহা তেমনি অটলভাবে রহিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, হিন্দুস্থানের জলবায়ু লোকের মনকে শিথিলযত্ন করিয়া তুলে ; তাহাও বটে, কিন্তু প্রকৃত কারণ এই যে, জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রতি তাহাদিগের অত্যন্ত টান ও শ্রদ্ধাভক্তি। যাহার নিকট হইতে সেই সকল ভাব পূর্ণ হয় তাহাকে তাহারা দেবতুল্য দেখে। পূর্ব্বে যেমন অগ্নি সূর্য্য মেঘ হইতে উপকার পাইয়া তাহাদিগকে দেবতারূপে কল্পনা করিয়াছিল, তেমনি বিদেশের কোলাহলের মধ্যে শান্তিপূর্ণ স্বদেশের সম্বাদ পাইয়া এবং বাহিরের শারীরিক কার্য্যের মধ্যে আত্মা ও পরমাত্মার সম্বাদ পাইয়া কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধাভক্তিতে পূর্ণ হইয়া সম্বাদদাতাদিগকে দেবতানির্ব্বিশেষে মানিতে লাগিলেন। সম্বাদদাতাদিগকেও সম্বাদের বিষয় করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি।

ক্ষত্রিয়।

তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার বংশ, যাঁহারা প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের নায়ক ছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন রাজ্যের রাজা হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিলেন যুদ্ধ করা ইঁহাদিগের জীবনের কার্য্য (profession) হইয়া পড়িল, ইঁহারাই ক্ষত্রিয় জাতি হইলেন। ইহারা একদিকে উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া এবং গো সুবর্ণ প্রভৃতি ধন দান দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের মহিমা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন ; আর একদিকে কৃষকদিগকে উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া উপনিবেশকে পালন করিতে লাগিলেন।

বৈশ্য ও শূদ্র।

এই যে উপনিবেশের বাসিন্দা যাহারা চাষ-আবাদ ও আপন আপন ব্যবসায় করিতে লাগিল, তাহারাই বিশ কিনা বৈশ্যজাতি হইল ; ইহারাই সাধারণ মানুষ হইল। রাজা ইহাদিগেরই রাজা, এই জন্য রাজাকে বিশপতি বা বিশাম্পতি বলিত। ইহারা আবার শূদ্রদিগকে ধরিয়া মুটে-মজুরগিরি করাইয়া লইত। এই তিন (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) হইল জেতৃজাতি। আর জিতজাতি আদিমবাসী দস্যুগণ অথবা যাহারা ব্রাহ্মণধর্ম্ম হইতে পরিচ্যুত হইয়া ব্রাত্য হইয়া পড়িল। যাহারা আদিমবাসীদিগের পরিণয়ে বদ্ধ হইয়া জেতৃজাতিতে কলঙ্ক আরোপ করিয়া পতিত হইল, তাহারাই বর্ণসঙ্কর প্রভৃতি হইল, তাহারাই শূদ্র হইল। এখনকার দাস শব্দ বোধ হয় দস্যু শব্দের অপভ্রংশ হইয়াছে। ইহারা যে আদিমবাসীর বংশ তাহা মনে করিতে হইত না। কিন্তু দাস-শব্দ এক চিহ্ন-স্বরূপ, যাহাতে তাহাদিগের শূদ্রতা ব্যক্ত হইতেছে। ইহাদিগের আকারগঠনে ইহাদিগকে আর্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া বোধ হয়। আমাদের বঙ্গদেশে ঐরূপ কৌতুককর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। বালির দত্তেরা বড় স্বাধীন। যখন গৌড়দেশে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসেন তখন তাঁহাদিগের সঙ্গে সহায়রূপে পাঁচজন শূদ্রও আইসে। তন্মধ্যে অন্যেরা ব্রাহ্মণের ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়া তাহারা উন্নত হইল, দত্তেরা ভৃত্যত্ব স্বীকার না করাতে উচ্চ কায়স্থস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইল।

এমন অনেক প্রবাদ আছে যে ক্ষত্রিয় রাজারা সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণের আধিপত্যে বিরক্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের উপরে আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রাখিতে পারেন নাই।

স্মৃতি।

স্মৃতির প্রবাহ যখন পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতে আসিতে ক্রমেই পরিবর্ত্তন হইতে হইতে আর পুরাতন কিছুই থাকিল না, তখন তাহা গ্রন্থবদ্ধ হওয়া আবশ্যক হইল। অবশ্য ইহা শ্রুতির অনেক পরে। কেননা শ্রুতিটা কঠিন ব্যাপার হইল। স্মৃতিটা অত শীঘ্র লোকের মন হইতে যাবার সম্ভাবনা ছিল না। স্মৃতি যে সময়ে সংগৃহীত হইয়াছিল, সে সময়ে যেন ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণ আধিপত্য। কিন্তু গার্হস্থ্য আচার-পদ্ধতি (manners and customs) পূর্ব্বের মতই অনেকটা ছিল। ইহা দ্বারা পুরাকালের ভাব বেশ পাঠ করা যায়। এই সকলেতেই হিন্দুদিগের ব্যবহার-সাহিত্যের আদি অন্বেষণ করিতে হইবে। civil law দণ্ডনীতি এবং রাজনীতি এসব যেমন যেমন প্রয়োজন আসিতে পারে, বাহুল্যরূপে গ্রন্থবদ্ধ হইল। বেদের সময় দেখা যায় ভায়েরা সব একত্র থাকিত, কিন্তু ভায়েদের ছেলেরা স্বতন্ত্র কর্ত্তা হইল; সেই জন্য শত্রুর পর্য্যায় হইতেছে 'ভ্রাতৃব্য'। অর্থাৎ ভায়ে ভায়ে বেশ মিলিয়া মিশিয়া থাকিত, ভাইপো হইলেই বিষয় লইয়া টানাটানি পড়িত, খুড়া বা জ্যেঠার যেন সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা থাকিত না।

বৌদ্ধধর্ম্ম।

জ্ঞানপদার্থের সহিত জড়পদার্থের সম্বন্ধের বিচার লইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি। সাংখ্যমত হইল বৌদ্ধদিগের, বেদান্তমত হইল ব্রাহ্মণদিগের। এক হইল জড়প্রধান, দ্বিতীয় হইল পরমাত্মপ্রধান। অনাত্মবাদী কপিল মুনি সাংখ্যদর্শনের আবিষ্কারক; বৌদ্ধেরা তাঁহাকে আদি-বুদ্ধ বলেন; অর্থাৎ শাক্যমুনি সাংখ্যদর্শন অবলম্বন করিয়া আপনার মত প্রকাশ করেন। শাক্যমুনির ধর্ম্ম যে নিরীশ্বর ধর্ম্ম তাহা নয়, উহা সেশ্বর ধর্ম্ম; কিন্তু উহার দর্শন সাংখ্য হওয়াতে, তাঁহার ছাত্রেরা বৌদ্ধধর্ম্মকে ক্রমে নিরীশ্বর ধর্ম্ম করিয়া ফেলিলেন। যখন শাক্যমুনি আপনার ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন ব্রাহ্মণধর্ম্মের মূল পর্য্যন্ত লইয়া টানাটানি পড়িল; যেহেতু ক্ষত্রিয় এবং অন্যান্য উৎপীড়িত শ্রেণী ইহাকে সহায় করিয়া ব্রাহ্মণ-দিগের একাধিপত্য হইতে মুক্ত হইবার জন্য উদ্যুক্ত হইল। তখন হয়ত মানব-গৃহ্যসূত্রের উপর নির্ভর করিয়া মনুসংহিতা প্রস্তুত হইয়াছিল। কপিলমুনির সাংখ্য-দর্শনের পর বোধ হয় শাক্যমুনির অবতরণ। তাহার একটা কারণ এই, বৌদ্ধধর্ম্ম এতটা দর্শনের উপর নির্ভর করে, যে, বৌদ্ধধর্ম্মপ্রণেতাকে মুনি উপাধি দেয়। কপিল যদিচ দর্শনকার, এবং আধুনিক সংস্কৃতে যদিও উঁহাকে মুনি বলে, কিন্তু বেদে এবং রামায়ণ প্রভৃতি পুরাতন সংস্কৃত-গ্রন্থে উঁহাকে ঋষি বলিয়াই বলিয়াছে; শাক্যকে কখনও ঋষি বলে নাই, কিন্তু মুনি বলিয়াছে।

রামায়ণ, মহাভারত ও বৌদ্ধধর্ম্ম।

রামায়ণ-মহাভারতের অনেক পরে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব। রামায়ণ-মহাভারতে ব্যাকরণ যতটা বদ্ধ হওয়া আবশ্যক, তাহা হয় নাই। মহাভারতে রহিয়াছে, জনমেজয় তক্ষশিলা জয় করিতে গিয়াছিলেন; সিকন্দরের সময় তক্ষশিলার 'তক্সিলা'রূপ প্রাকৃত উচ্চারণ হইয়া পড়িয়াছে। নন্দবংশ প্রভৃতি আধুনিক কালের বৌদ্ধ-ধর্ম্মেরই সমকালবর্ত্তী। কপিলঋষি যদি অযোধ্যার সগর রাজার সমকালীন হয়েন—যে কপিল ঋষির উল্লেখ বেদের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে সে কপিল ঋষি বৌদ্ধধর্ম্মের কত পূর্ব্বে? বুদ্ধ অবতার কৃষ্ণাব-তারের পরে। বৌদ্ধধর্ম্ম যে অবধি প্রচার হইয়াছে, সে কাল ইতিহাসের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। রামায়ণ মহাভারত ইতিহাসের দিকে আসিবার চেষ্টা করিয়াছে মাত্র।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণধর্ম্মের সংস্কার।

যখন আত্মোৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি পড়ে নাই, কেবল দেবদেবীর উপাসনা করিলেই মুক্তি, এই ভাব প্রবল ছিল; আপনাকে উন্নত করিবার দিকে লক্ষ্য ছিল না; ব্রাহ্মণেরা যখন ভ্রষ্টাচার হইয়া পড়িল, তাহাদিগের আধিপত্য যখন তাহাদিগের জ্ঞানের উপর নির্ভর না করিয়া কেবল জাতিগত হইয়া দাঁড়াইল, তখনি বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মকাল। যখন ব্রাহ্মণদিগের প্রতি শ্রদ্ধা কমিতে আরম্ভ হইয়াছে, তখনই এই নূতন ধর্ম্মের আরম্ভ বলিতে হইবে। তখন সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা চলে না, প্রাকৃততেই কথাবার্ত্তা চলে, আর শ্লোকাদি আধ-সংস্কৃত আধ-প্রাকৃত এইরূপ একপ্রকার গাথায় রচিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্ম-প্রসূত পুরাণ প্রভৃতির এবং বলিদানযুক্ত যাগযজ্ঞের বিপক্ষে ব্রাহ্মণজাতির প্রাতিকূলে উত্থিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণধর্ম্মের সংস্কাররূপে উদয় হইল; এইজন্য ইহা হৃদয়ের ভাবের উপর তত না দাঁড়াইয়া বুদ্ধির উপর দণ্ডায়মান হইল। ইহা দার্শনিক ধর্ম্ম হইল। এই ধর্ম্ম সাংখ্যমতের উপর দণ্ডায়মান থাকাতে, শেষে ইহা নিরীশ্বর ধর্ম্ম হইয়া পড়িল, কেবল কর্ম্মের ধর্ম্ম এবং আত্মোৎকর্ষের ধর্ম্ম হইল। সে ধর্ম্ম কতকাল তিষ্ঠিতে পারে? ছোটলোকদিগের মধ্যে সেই ধর্ম্ম গিয়া পুনরায় পৌত্তলিক ধর্ম্ম হইয়া পড়িল; অনেক পৌত্তলিক ধর্ম্ম ছিল, তাহার মধ্যে ইহাও একটা বেশী হইল মাত্র। তবে ইহা দ্বারা এই উপকার হইল যে, ব্রাহ্মণেরা যে সুখে শয়ান ছিলেন তাহা ঘুচিয়া গেল। ব্রাহ্মণধর্ম্মের

আলোচনা ও স্বাভাবিক সংস্করণ হইতে আরম্ভ হইল অর্থাৎ বেদকে বজায় রাখিয়া ব্রাহ্মণদিগের দ্বারাই হিন্দু-ধর্ম্মের সংস্করণ হইতে লাগিল। সেই সংস্কারকদিগের মধ্যে প্রধান হইতেছেন শঙ্করাচার্য্য। তিনি বেদ-বেদান্ত লইয়া আপনার মতানুরূপ তাহাদের টীকা করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের পর বৈদিক ধর্ম্মের তিনিই পুনরুদ্ধারকর্ত্তা বলিতে হইবে; উঁহারই উপনিষদ লইয়া রামমোহন রায় আমাদিগের দেশে সমুদয় নিদ্রিত লোককে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন।

দ্রৌপদীর বিবাহরহস্য।

(শ্রীবীরেশ্বর সেন)

মহাভারতের কথা সর্ব্বদাই অমৃতসমান। মহাভারতের যে কোন অংশ লইয়া যখনই আলোচনা হয়—সে আলোচনা বিরুদ্ধই হউক বা অনুকূল হউক, তাহা সর্ব্বদাই চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ সিংহ এম এ, বি-এল, মহাশয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এইরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেজন্য তিনি পাঠকমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহার প্রথম আলোচনায় বিষয় ছিল দুর্য্যোধনই কুরুরাজ্যের ন্যায়ানুমোদিত উত্তরাধিকারী ছিলেন, না যুধিষ্ঠিরই তাঁহার ধর্ম্মানুযায়ী উত্তরাধিকারী ছিলেন। এবং তিনি উত্তররূপেই মহাভারত হইতেই প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন যে, দুর্য্যোধনই ধর্ম্ম এবং ন্যায়ানুসারে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন। দুইএক জন সমালোচক ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিবাদের বিশেষ মৌলিকতা দেখা যায় না। একজন প্রতিবাদকারী অতি ক্ষুদ্র একখানি পত্র ইংরাজীতে লিখিয়া এইমাত্র জানাইতেছেন যে কৌটিল্য বলিয়াছেন যে "যুধিষ্ঠিরকে প্রকৃত দায়াদাধিকার প্রত্যর্পণ না করাতেই দুর্য্যোধন নিপাত লাভ করিয়াছিলেন।" এই প্রতিবাদকারী বাঙ্গলা পত্রিকাতে বাঙ্গলা-ভাষায় লিখিত আলোচনা সম্বন্ধে যে ইংরাজীতে মন্তব্য লিখিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি যে কয়েকটা কথা লিখিয়াছেন তাহা বাংলায় অবশ্যই লিখিতে পারিতেন।* কিন্তু সে কথা যাউক। তিনি হয়ত ভাবিতেছেন যে, কৌটিল্যের উক্তিই সিংহমহাশয়ের আলোচনা সম্বন্ধে clincher অথবা চূড়ান্ত কথা। কিন্তু প্রতিবাদকারীর স্মরণ করা উচিত ছিল যে কৌটিল্য যাহা বলিয়াছেন ব্যাসও তাহাই বলিয়াছেন এবং সিংহমহাশয় সেই উক্তি খণ্ডন করিবার জন্যই স্বীয় আলোচনা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি সিংহমহাশয় মহাভারতেরই আর একটি বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া "দ্রৌপদী কি পাণ্ডবদিগের বিবাহিত ধর্ম্মপত্নী" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে দ্রৌপদীর বিবাহ কেবল যুধিষ্ঠিরের সহিতই হইয়াছিল। এ সম্বন্ধেও বোধ হয় কেহই সিংহমহাশয়ের ভ্রম হইয়াছে এমন কথা বলিতে পারিবেন না। তবে দ্রৌপদী অপর চারি পাণ্ডবের পত্নী হইলেন কিরূপে?

এই কথার বিচার করিতে হইলে কেবল মহাভারতে যাহা লিখিত আছে তাহার প্রতি নির্ভর করিলে চলিবে না। আমরা যদি তদতিরিক্ত আরও দুই-একটি ঐতিহাসিক এবং সর্ব্বজনবিদিত তথ্যের বিষয় স্মরণ করি তাহা হইলে কেবল মহাভারতের নহে, রামায়ণেরও দুই-একটা বিষয় আমাদের সমক্ষে স্পষ্টতর ভাবে উপলব্ধ হইবে।

প্রথমে এই দ্রৌপদীবিবাহের কথাই বলিব। পাণ্ডবপঞ্চকের জন্ম হইয়াছিল তিব্বতে বা হিমালয়েরই দক্ষিণ-সান্নিধ্যে। সে দেশে যে সকল সহোদরে মিলিয়া একটী নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে, ইহা একটী ঐতিহাসিক এবং সর্ব্বজনবাদিত তথ্য। এখনও এই প্রথা তিব্বতে এবং হিমালয়ের সানুতে প্রচলিত আছে। পাণ্ডবেরা সেই প্রদেশেই প্রসূত এবং যৌবন পর্য্যন্ত তথায় লালিতপালিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। দ্রুপদরাজ্য পাঞ্চাল হিমালয়েরই সানুদেশে; সুতরাং সেখানেও এখন না হোক পূর্ব্বকালে একাধিক ভ্রাতার একমাত্র নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করার প্রথা ছিল বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পাণ্ডবেরা সেই প্রথার অনুবর্ত্তন করিয়া সকলে মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দ্রুপদও তাহাতে বাধা দেন নাই, কেননা তাঁহার দেশেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। ইহার বহু পরে যখন মহাভারত রচিত হয় তখন সেই কুপ্রথা হিন্দুদেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু গ্রন্থকার এত বড় একটা রাজকুলের ঘটনা গোপন করিতে পারিলেন না। তাই কুন্তীর এবং ব্যাসের মুখ দিয়া তাহার বালকোচিত হেতুবাদ বা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। নতুবা কুন্তী পুত্রদিগকে ভিক্ষালব্ধ বস্তু সমান ভাগ করিয়া লইতে বলিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহারা সকলে মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা বাতুলোচিত এবং অশ্রদ্ধেয় কথা। এখনও তিব্বতে বিবাহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই করিয়া থাকে; কিন্তু সেই নারী হইয়া থাকে সকল ভ্রাতারই পত্নী।*

---

* প্রতিবাদকারী দেখেন যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বাংলা ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই প্রবন্ধ বাহির হয়। সম্ভবত সেই কারণে ইংরাজীতে প্রতিবাদ লিখিতে দ্বিধা করেন নাই। তঃ পঃ সঃ

* ভারতবর্ষের শ্রাবণ-সংখ্যায় কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ দেব রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে সিংহল-দেশেও এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। এই সম্বন্ধে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কার্ত্তিক-সংখ্যায় পাত্রকাপরিচয় দ্রষ্টব্য। তঃ পঃ সঃ

মহাভারত একটা ঐতিহাসিক কাব্য। ইহাতে সত্যের সম্পূর্ণ অপলাপ হয় নাই, কিন্তু কার্য্যো চত অনেক ঘটনার সংবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যিনি এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন তিনি পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়াই তাহা লিখিয়াছেন। তিনি যে বলিবেন যে, ধর্ম্ম পাণ্ডবদের পক্ষে ছিলেন, ইহা মোটে বিস্ময়ের বিষয় নহে। বিবাদী পক্ষের তীক্ষবুদ্ধি ব্যবহারাজীব বাদীপক্ষের সাক্ষীকে কূট প্রশ্ন করিয়া এমন উত্তর বাহির করেন, যাহাতে বিবাদীর পক্ষই সমর্থিত হয়। সিংহ মহাশয় সেইরূপ পাণ্ডবপক্ষপাতী ব্যাসকে জেরা করিয়া তাঁহারই মহাভারত হইতে এই কথা বাহির করিয়া লইয়াছেন যে, কুরুরাজ্যের ন্যায্য অধিকার দুর্য্যোধনেরই ছিল।

এইরূপ অন্য ইতিহাসের সহিত রামায়ণ মিলাইয়া সমালোচনা করিলে এমন অনেক অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব সত্য বাহির হইয়া পড়ে, যাহা অনেকের বিস্ময় উৎপাদন করিবে।

প্রাণদণ্ড রহিত হওয়া উচিত।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

"চক্ষুর জন্য চক্ষু এবং দন্তের জন্য দন্ত" (Eye for eye and tooth for tooth) এই একটি নিষ্ঠুরতম প্রথা মানবের অভিব্যক্তির সময় অবধি চলিয়া আসিতেছে বোধ হয়। বলা বাহুল্য ইহার উৎপত্তি মানবের হিংস্র পশুভাব হইতে। তুমি কুকুরের লেজে পা দাও সে তোমাকে কামড়াইবে—তোমার ভুল বশত তাহার লেজ মাড়াইয়াছ কিনা সে বিচার সে করিবে না। এইরূপে কত প্রকৃত নির্দ্দোষী লোক যে হিংস্র জীবজন্তু ও মানবের হাতে নিহত হইয়াছে, তাহা কে জানে? সেইরূপ উপরোক্ত হিংস্র মন্ত্রের কারণে কত নিরীহ মানবও হিংস্র মানবের হস্তে নিহত হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? নিরীহ মানবের কথা বলিলাম এই জন্য যে, অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, বিচারবিভ্রাটের ফলে প্রকৃতই নিরীহ ও নির্দ্দোষ মানব কঠিন দণ্ড পায়, এমন কি তাহাকে মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত বহন করিতে হয়। সকলেই জানেন যে খুন বা নরহত্যা করিলে ফাঁসিদণ্ড হয়। একটা খুন হইল; আসল খুনী হয় তো কোন প্রকারে পলায়ন করিল; হয় তো একজন নিরীহ ব্যক্তি খুনের জায়গায় দাঁড়াইয়াছিল, পুলিশ তাহাকেই খুনী ভাবিয়া চালান দিল। চালান দিবার পর পুলিশের জেদ চাপিয়া যায়, যাহাতে চালানী আসামীর দোষ প্রমাণিত হয়, কারণ প্রমাণ না করিলে পুলিশের বদনাম হয় এবং তজ্জন্য উপরওয়ালার কাছে বড়ই জোর ধমক পাইতে হয়। অনেক সময়ে পুলিশেরও দোষ থাকে না—অবস্থাঘটিত সাক্ষ্যের বলে নির্দ্দোষী আসামীরও দণ্ড না হইয়া যায় না।

বহুপূর্ব্বের একটা খুনী মকদ্দমার দৃষ্টান্ত দিতেছি। সকলেই জানেন স্পেশ্যাল জুরীতে ৯জন করিয়া জুরী নির্ব্বাচিত হন। উক্ত মকদ্দমায় ৯জনের মধ্যে ৬জন দেশীয় ও ৩জন বিদেশীয় ছিলেন। ৫জন দেশীয় ও ১জন বিদেশীয় একমত হইলেন যে আসামী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। শেষে আর একজন দেশীয় আসামীর দোষ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করায় দেশীয় জুররগণ সকলে তাঁহাকে benefit of doubt দিবার জন্য অনুরোধ করায় তিনি তাঁহাদেরই দিকে মত দিলেন। কিন্তু একজন বিদেশীয়, যিনি হোমরা-চোমরা লোক ছিলেন—একটা সুপ্রসিদ্ধ কোম্পানীর বড় সাহেব ছিলেন—তিনি প্রাণদণ্ডের পক্ষে বড়ই জেদ ধরিলেন। দ্বিতীয় বিদেশীয়টী তাঁহারই অনুগত ব্যক্তি ছিলেন—তিনি জুররগণের আপোষে বিচারস্থলে দেশীয়গণের সহিত একমত প্রকাশ করিলেও রায় দিবার সময় উক্ত বিদেশীয়ের পক্ষেই রায় দিলেন। যাই হোক, উক্ত আসামী ছাড়ান পাইল। কিছু কাল পরে উক্ত মোকদ্দমায় যিনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি স্পষ্টই বলিতেন যে পুলিশের সাক্ষ্য বিশ্বাসের অযোগ্য ছিল। বিশ্বাসের যোগ্য বা অযোগ্য ছিল, তাহার বিচার এখানে করিতে চাহি না। আমাদের বক্তব্য এই যে, এক্ষেত্রে আমরা ধরিতে পারি যে, আসামী প্রকৃতই নির্দ্দোষী ছিল। এই নির্দ্দোষী আসামীর অবস্থাঘটিত সাক্ষ্যের বলে যদি প্রাণদণ্ড হইত তবে কি ঘোর পরিতাপের বিষয় হইত!

কিন্তু এসকল বিষয়ে পুলিশ একপ্রকার অসাড় হইয়া যায়—বিনা দোষে কাহার প্রাণদণ্ড হইল, অথবা দোষ প্রমাণের ফলে কাহার প্রাণদণ্ড হইল, সাধারণত দেখা যায় যে, সেদিকে পুলিশের নিম্নতন কর্ম্মচারীদিগের বিশেষ একটা লক্ষ্য থাকে না, উচ্চতন কর্ম্মচারীদিগের কতকটা থাকিলেও থাকিতে পারে। নিম্নতন কর্ম্মচারীদের প্রধান লক্ষ্য থাকে যে, কিসে তাহারা পদোন্নতি পায় আর পকেট ভর্ত্তি হয়—কাজেই তাহাদের চালানী আসামীর দণ্ড লাভ হইলেই হইল। কসাইদের প্রাণ যেমন জোড়া ছাগল বধ করিতে কাঁদিতে কাঁদিতে ভুলিয়া যায়, পুলিশেরও প্রাণে ক্রমশ মানুষের প্রাণের উপর মায়ামমতা চলিয়া যায়। একবার কোন সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্রচিকিৎসকের সহিত কথালাপে, তাঁহারা অস্ত্রোপচারে এত উৎসুক কেন, জিজ্ঞাসা করায় তিনি স্পষ্ট বলিলেন যে, operation এর একটা বিষয় পাইলেই operation করিবার জন্য তাঁহাদের হাত

সুড়সুড় করে। ঠিক সেইরকম, খুনের সন্ধান পাইলেই হইল—তখন পুলিশের প্রাণ তাহারই উপলক্ষ্যে একজন না একজনকে চালান দিতে ও সেই চালানী আসামীকে by hook or by crook চরম দণ্ডে দণ্ডিত করাইতে যেন নিঃস্পিষ্ট করিতে থাকে।

এখন নির্দ্দোষী হউক বা দোষী হোক, ঐ প্রকারে যে কোন সূত্রে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণের বলেই হোক বা অবস্থাঘটিত সাক্ষ্যের (circumstantial evidence) বলেই হোক, চরম দণ্ডে দণ্ডিত হইলে তাহার ফল কি? তাহা আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথম বুঝিতে হয় যে, আইনের প্রয়োজন কি? বর্ত্তমান জ্ঞানোজ্জ্বল যুগে সাধারণত বলা হয় যে, আইনের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া—এমন শাস্তি দেওয়া, যাহার ফলে ভবিষ্যতে সে সেরূপ অপরাধ না করে, এবং তাহার অপরাধের বিষময় ফল দেখাইয়া অপর পাঁচজনকে সেরূপ অপরাধ হইতে নিবৃত্ত করা। এখন যদি আইনের ইহাই উদ্দেশ্য হয়, তবে প্রাণদণ্ডে কি তাহা সিদ্ধ হয়? আমাদের তো বোধ হয় তাহা হয় না। নির্দ্দোষীর প্রাণদণ্ড হইল—তাহার ফলে বিচার-বিভ্রাট দেখিয়া সেই নির্দ্দোষী ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধব, যাহারা তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া জানে, তাহারা প্রকাশ্যে না হৌক, অন্তরে অন্তরে বিচারপদ্ধতিরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং অপর পাঁচজনকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিতে লাগিল। সর্ব্বোপরি, একটা নির্দ্দোষী মানুষের প্রাণ তো যাহা যাইবার ছিল, তাহা তো গেল।

এই সেদিনকার আমেরিকায় স্যাকো ও ভেনজেট্টির বিখ্যাত বিচারের বিষয় অনেকেই জ্ঞাত আছেন। ঐ মকর্দ্দমায় উক্ত আসামীদ্বয় শেষ পর্য্যন্ত নিজদিগকে নির্দ্দোষী বলেন। ঐ দেশেও ঐ বিচার লইয়া বিশেষ আন্দোলন হয় এবং অনেকেই আসামীদের প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবার উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু বিচারপতিগণ সংগৃহীত অবস্থাঘটিত প্রমাণাদির উপর নির্ভর করিয়া আসামীদ্বয়ের প্রাণদণ্ডই বাহাল রাখিতে বাধ্য হন এবং যথাকালে আসামীদ্বয় প্রাণদণ্ড ভোগ করে। তাহাদের প্রাণদণ্ডের কিছুকাল পরে আরও প্রমাণাদি প্রকাশ হওয়ায় সকলেই একমত হন যে ঐ আসামীদ্বয় সত্যই নির্দ্দোষ ছিল। কিন্তু হায়! তৎপূর্ব্বেই তাহারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। এইরূপে নির্দ্দোষী দুইটী লোক অন্যায় বিচারের ফলে প্রাণ হারাইল। কি পরিতাপের কথা!

সুতরাং নির্দ্দোষীকে দণ্ড দিবার সম্ভাবনার দিক হইতে আলোচনা করিলে প্রাণদণ্ডের কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। অপর দিকে প্রকৃত দোষী ছাড় পাইল—সে তাহার দলে নিজের ধরা না পড়ার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আরও পাঁচজনকে টানিতে লাগিল। কাজেই প্রাণদণ্ড সমর্থন তো করা যায়ই না, বরঞ্চ দেখা যাইতেছে যে, ইহার পরিণামে কুফলই হয়। উত্তরকালে যদি কখনও ঐ নির্দ্দোষী ব্যক্তির নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত হয়, যদি প্রকৃত দোষী অনুতপ্ত হইয়া নিজের দোষ প্রমাণিত করে, তখন তো আর সেই নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়া অন্যায় বিচারকে কলঙ্কমুক্ত করিবার কোনই অবসর থাকে না, কারণ সে ইতিপূর্ব্বেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ইহার বিপরীতে যদি ঐ নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে কোনবিধ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত, তাহা হইলে সময়ে তাহার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন হইলে তাহাকে মুক্তিদান করিয়া বিচারবিভ্রাটকে কলঙ্কমুক্ত করিবার একটা সম্ভাবনা থাকিত।

আবার, যদি প্রকৃত দোষীরও দোষ প্রমাণিত হইবার কারণে তাহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রকৃত পক্ষে অনুতাপের অবসর তো দেওয়া হয় না। বরঞ্চ সে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে তাহাকে অনুতাপের অবসর দেওয়া হইত; এবং অনেক স্থলে দেখাও গিয়াছে, কোন কারণে হত্যাকারী কারাদণ্ড ভোগ করিতে করিতে অনুতপ্ত হইয়া মুক্তিলাভের পরে সাধুভাবে দিন যাপন করিয়াছে।

অনেক সময়ে খুনাখুনি দৈবাৎ হইয়া পড়ে; অথচ ঠিক সেই দৈবাতের ভাব বা বিশেষ কারণে সহসা উত্তেজিত হইবার ভাব প্রভৃতি প্রমাণিত করিতে না পারিলে আসামীর ভাগ্যে প্রাণদণ্ডই লাভ হয়। এতদ্ব্যতীত, এমন অনেক বিষয় আছে, যথা—রাজদ্রোহ প্রভৃতি—যাহার কারণে প্রাণদণ্ড কোন কারণেই দেওয়া উচিত নহে; বরঞ্চ তদ্বিপরীতে ঐ প্রকার অপরাধীদিগকে কারাদণ্ড দেওয়াই সঙ্গত—ইচ্ছা কর যদি অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিতে, তবে দ্বীপান্তরবাসে দণ্ডিত কর। সেই শাস্তি পাইয়া সে সময়ে অনুতপ্ত হৃদয়ে পরিবর্ত্তিত অন্তঃকরণ লইয়া রাজদ্রোহী হইবার পরিবর্ত্তে রাজভক্ত প্রজারূপে দাঁড়াইতে পারে। আমার এই প্রকার একটী দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ হইয়াছে বলিয়া এবিষয়ে জোর করিয়া বলিতে পারি। একটী ছাত্র আমার পরিচিত ছিল। সহসা একদিন সে আমার নিকট আসিয়া অভিনয়ভঙ্গীতে হাতপা নাড়িয়া ক্রমাগত বলিতে লাগিল—this bureaucratic goverment must go। আমি তাহাকে তাহার ছাত্রাবস্থায় ঐ প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অযৌক্তিকতা দেখাইয়া ঐ প্রকার বক্তৃতা করিতে নিষেধ করিলাম। কয়েক

দিন পরেই শুনিলাম যে, সে ঐ প্রকার বক্তৃতার ফলে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। কয়েক মাস পরে মুক্তিলাভ করিয়া আমার সঙ্গে সে দেখা করিয়া বলিল যে, জেলকর্তৃপক্ষ তাহার সহিত খুবই সদ্ব্যবহার করিয়াছে, এবং সে এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মত ন্যায়পরায়ণ গবর্ণমেণ্ট দ্বিতীয় নাই! তাহার প্রথম বা দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের সহিত কেহ একমত হইতে পারুন বা নাই পারুন, তাহা বিচারস্থলে আনার প্রয়োজন নাই। আমি দেখাইতে চাই, প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে কারাদণ্ডের ফলে আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সিদ্ধ হয়; প্রাণদণ্ডে শুধু যে আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় তাহা নহে, বরঞ্চ পরিণামে সেই উদ্দেশ্যের বিপরীত ফলও অনেক সময়ে ফলিবার সম্ভাবনা আসে।

আমাদের সর্ব্বশেষ কথা এই যে, যে মানুষ দুর্লভ জন্ম এই মানুষজন্ম লাভ করিয়াছে, তাহার জীবন যখন আমরা দিতে পারি না, তখন ঐখানেই তো ভগবানের ইচ্ছা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, মানুষের জীবন কোন সূত্রেই লইবারও অধিকার আমাদের নাই। শুধু মানুষ কেন, আমার মতে কোন জীবেরই প্রাণ হনন করিবার অধিকার আমাদের নাই। আত্মরক্ষা বা অন্য কোন বিশেষ কারণে অপরকে নিহত করিতে পারা যায় কি না, সে বৃহৎ সমস্যার নিরাকরণে উদ্যত হওয়ার এখানে অবসর নাই। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে আইন হইতে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া উচিত। যাঁহারা উহাকে বর্ব্বর প্রথার নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহারা বড় মিথ্যা বলেন না। আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইল, এই প্রাণদণ্ড উঠাইয়া দিবার জন্য বিলাতে বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু কি কারণে তাহা বন্ধ হইল তাহা বলিতে পারি না। উদ্যোক্তাগণ ঐ অবস্থাঘটিত সাক্ষ্যে যে সর্ব্বদা প্রকৃত দোষী ধরা পড়ে না, বরঞ্চ অনেক সময়ে নির্দ্দোষী ব্যক্তিই দণ্ডিত হয়, তাহারই উপর খুবই ঝোঁক দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে বরঞ্চ শত দোষী ব্যক্তি মুক্তিলাভ করুক, তাহাতে তত ক্ষতি হইবে না, যত ক্ষতি হইবে একজন নির্দ্দোষীর প্রাণদণ্ডে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, বিলাতে এবিষয়ে আবার আন্দোলন চলিতেছে। এই নিষ্ঠুর প্রথা যত শীঘ্র সভ্য সমাজ হইতে উঠিয়া যায়, ততই মঙ্গল, ততই সমাজ উন্নতির পথে শীঘ্র অগ্রসর হইবে।

THE

Message of Buddhist India.*

DHARMA ADITYA DHARMACHARYYA.

To-day marks an epoch-making day in the world's history, because it was on this day, the Full Moon Day of Vaisakh that the greatest religious and social reformer, the noblest harbinger of worldpeace and human brotherhood appeared in this mortal world 2 553 years age. It was then a period of rank materialism, Brahminical sacerdotalism, caste bigotry, religious controversies. The priests and people were engrossed in offering animal sacrifices and were holding elaborate ceremonies in the name of religion. Religions controversies and belief in diverse systems of religion and philosophy were the order of the day. Caste had ceased to be a professional organisation; the Brahmins had begun to make it an air-tight department with limitations and restrictions over the economic and social affairs of public life. The priests and people had grown pantheistic and everything cosmic or phenomenal they attributed to the mercies of an imaginary god whom they had never seen. It was in such a period that Buddha appeared on earth in order to instil into the hearts of mankind the true original spirit of human brotherhood and spiritual culture. To-day we are assembled here to commemorate this holy, historic event connected with the Birth, Buddhahood and Nirvana of Lord Buddha.

It may be interesting to recall in a brief space of time the life and career of the Sakya prince, Prince Siddhartha, who determined to give his life and soul to the service of humanity, was born at the Lumbini Park, in modern Rummindiha lying within the State of Nepal. Born in the lap of luxury, in the royal family of the Sakyas, in the Ikshvaku solar dynasty, he was to have become the

---

* A speech of the Founder and Religious president delivered on the Buddha Day held by the Buddhist India Society on the Vaisakh eighth bright day, May 16th 1929 under the presidentship of Acharyya Sj. Kshitindra Nath Tagore.

heir-apparent of his father, King Suddhodana, who was reputed to be the ruler of the first known republic state of Kapilavastu in India. From boyhood he had a philosophical turn of mind and while meditating under the Jambu tree, he realised the utterly miserable state of this mortal life. Married at the ripe proper age of twenty to a beautiful princess Yasodhara, after passing through a test exhibition of his skill in all manly arts, such as archery, swordsmanship, before the general assembly of people and princes, he was furnished with royal accomodation in three royal mansions to spend their seasonal honeymoon there. The sight of Devadatta's killing of a swan inspired him to become the silent interpreter of the dumb millions who are slaughtered before the altar or in the butcher's workshop to satisfy the whims of the human beings who are engrossed in the quagmire of religious superstitions or selfish materialism. At the age of twenty nine, he saw the four purva nimittas or ominous signs which convinced him of the futility or transiency of material, mortal life, and found in the life of an active, self sacrificing monk the hopes of permanent contentment and happiness.

At the age of twenty-nine he renounced his parents, beloved wife, fresh-born child, royal possessions and the prospects of royal power, with the definite mission of seeking out a remedy for the inevitable ills of animal life. At the sacrifice of his own self, he boldly marched out at the dead of night to the Uruvilva forest near Gaya, cut off his hair with his own scimitar, put on the robes of a mendicant, underwent all sorts of penances for full six years, debated and discussed with the ascetics and sages of his time. Unable to find out the solution of life's problems, he gave up the extreme forms of ascetic life, he took food offered by the lady Sujata, walked off to the Bodhi or peepal tree at Buddha Gaya. He meditated and meditated, overcame all the visible and invisible temptations of life that the so-called Mara represented and discovered the path leading to the solution of life's problems. He had now become the Buddha, the Supremely Enlightened One, the Self enlightened Being. He found that it is ignorance and lust that led to the increase of Duhkha in the world and pointed out the need of understanding the law of Dependent causation and of following the Noble Eightfold Path.

Buddha did not remain content with the Path but laid down that Seela (noble activities), Samadhi (meditation) and Pragna (wisdom) form the three corner-stones of Buddhism—of Nirvana or eternal peace and bliss. He repudiated the then imaginary notions about the idea of God, the soul etc. and gave a clear, convincing analytical view about Nirvana or Moksha which forms the summum bonum of human aspiration, or the goal of spiritual perfection of every human being.

He, the Buddha then determined to proclaim to all that would hear Him, the Path that He had chalked out for the good and welfare of mankind. It was in the Deer-Park Benares that He first preached or turned the wheel of the law to the five Brahmins ascetic and to all others. When sixty disciples had gathered, he sent them each to one direction or region saying "Go ye O monks! wander forth for the gain of the many, for the gain, good and welfare of the whole mankind. Proclaim ye, O monks! the doctrine, glorious, perfect and pure." Each of the sixty disciples went to different parts of India and outside, made known to the people there of the message of worldpeace, unity and brotherhood. Wide, principled and simple was his message which appealed to all who heard it and who became followers of this ideal, holy path.

At the age of thiry-five He began his sacred mission of proclaiming to the princes and people the doctrine of spiritual freedom and worldpeace, for full forty five years. He went forth and travelled in all parts of India, preaching to the masses the gospel of a happy, enlightened life. He uplifted the degraded and the demoralised, gave consolation to the sick and the leper, reformed the evil class of people who had gone astray from the path of duty, purified the hearts of men and women who had fallen to the path of vices, removed the

doubts and misbeliefs of many a people who had been led astray by people of heterodox beliefs and dogmas.

Buddha did His utmost by able and convincing arguments, to do away with the later distinctions of caste that were created between man and man, gave a deathblow to the destructive belief of washing away sin by blood-sacrifices to the so-called angry gods or by a bath in the river Ganges, declared to the masses that they had their birth-right to understand the principles of Dharma which until then were denied to the people of lowprofessions, proclaimed the freedom of all to understand and realize the blessings of Dharma, denounced the dogmatic, unprincipled assertions of heretical teachers and gave a message of unity and freedom to all that were thirsty after spiritual knowledge.

Buddha was a rational thinker. He exhorted His followers not to believe anything merely because it is recorded in the Scriptures, or directed by certain priests or believers or because it is enjoined by some prophets or supernatural beings. He enjoined upon them the supreme advantages of rational and analytical reasoning over the vulgar, dogmatic, traditional assumptions.

Buddha is now regarded as the highest philosopher because He condemned all metaphysical speculations and imaginary suppositions and concentrated His whole attention to the practical solution of life's problems. He exhorted the audience to think of the problem ahead more than the problems imaginary or conjectural. Buddha was the greatest mystic, because by means of His supernormal visionary power based on different processes of contemplation, He had acquired the superpsychical power to understand the past, the present and the future. By samadhi or mystic contemplation He had vanquished many heretical teachers and pointed out the superior efficacy of samadhi and yoga.

With the quiet passing away of the Buddha at Kusinagar, modern Kasia, Sonkhpore the Malla's Grove, at the ripe age of eighty after 45 years of long ministry, comes to close the life and career of a prince saint or Rajarsi who cleared the dim vision of many a visionary, purified the hearts of many unpurified beings, led millions of people to the path of eternal and true salvation. •

—

রুষিয়া ও উড়িষ্যা।

(শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ এম-এ বি-এল])

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "নানা-কথার" মধ্যে "রুষিয়া নামের উৎপত্তি" পড়িয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম।

রুষিয়া বা 'উড়িসা' দেশের দক্ষিণাঞ্চলে "ওডেসা" (Odesa) নামক একটি সহর এখনও আছে। উহা ঐরূপ অর্থব্যঞ্জক কি না, অথবা পত্রিকায় ব্যক্ত মতানুযায়ী পুরাকালে ওড্র বা উড়িষ্যাদেশীয় কোন রাজা বা তদ্দেশীয় জনগণের কোনও এক অংশ ভারতের বাহিরে যাইয়া উক্ত ওডেসাতেই প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন কি না ও তাহা হইতেই ক্রমশঃ তদ্দেশের নাম 'উড়িসা' বা রুষিয়া হইয়াছে কি না? ইহার আলোচনা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। ঐরূপ হওয়াও আশ্চর্য্য নহে।

ভারতের একটি বহু পুরাতন মহাপথের পরিচয় জীবনে পাইয়াছি। উহা উত্তর-ভারত হইতে গঙ্গার ধার বাহিয়া তার পর পাটনা হইতে দক্ষিণ দিকে সাঁওতাল পরগণা, পরে বর্দ্ধমান জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশের ধার দিয়া বাঁকুড়া, মানভূম জেলার মধ্য দিয়া উড়িষ্যায় প্রবেশপূর্ব্বক বর্ত্তমান পুরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঐ পথ দিয়াই পাণ্ডবগণ হিড়িম্ব রাক্ষসের, পরে ভীমপুত্র ঘটোৎকচের রাক্ষসরাজ্যের অর্থাৎ বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণা বা ডুমকা জেলার মধ্য দিয়া বর্ত্তমান বীরভূম জেলার অন্তর্গত—চৈতন্যদেবের সহচর নিত্যানন্দ গোস্বামীর জন্মস্থান 'একচক্রা' গ্রামে আসিয়া কিছুকাল বসতি করিয়াছিলেন মনে হয়। পরে রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে দিগ্বিজয়কালে ভীম সম্ভবত ঐ পথ দিয়াই অগ্রসর হওতঃ তাম্রলিপ্ত বা বর্ত্তমান তমলুক (মতান্তরে বর্ত্তমান রাঢ়দেশ) জয় করিয়াছিলেন। নানা ঘটনায় কয়েকটি রাজবংশের সংস্রবে আসিয়া জানিয়াছি যে—পরে বহুকাল ঐ পথ দিয়াই উত্তর ভারতের অন্ততঃ রাজন্যবর্গ পুরীতীর্থে ও অনাত্র যাতায়াত করিতেন। ঐ সকল রাজযাত্রীদলের মধ্যে কোন কোন রাজা রাজপুত্র বা রাজবংশীয় বা বীর পথপার্শ্বের নানা জনপদ জয় করিয়া ফেলিতেন এবং সেই নবলব্ধরাজ্যে তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ দলবল সহ রহিয়া যাইতেন;

• বুদ্ধসম্বন্ধীয় এই প্রবন্ধটী কলিকাতার অন্যতম মহাযানপন্থী বৌদ্ধগুরু কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া আমরা সাদরে প্রকাশ করিলাম। লিখনভঙ্গী ও মতামতের জন্য লেখক দায়ী। ত০ প০ স০

এমন কি, অনেক স্থলে তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান। উড়িষ্যাদেশীয় ময়ুরভঞ্জের রাজবংশের, মানভূম জেলার কাশীপুর বা পঞ্চকোট রাজবংশের, ডুমকা জেলার পাবিয়া বা জামতাড়া রাজবংশের, মুঙ্গের জেলার গিধোর রাজবংশের, আরা জেলার মহারাজা বিক্রমাদিত্য ও ভোজরাজবংশ অর্থাৎ বর্ত্তমান ডুমরাওন রাজবংশের ইতিহাসালোচনায় ইহার সত্যতা প্রমাণ হইবে। অন্যান্য অনেক বংশাবলী হইতেও সম্ভবতঃ ইহা জানা যাইবে।

এইরূপ ভারত হইতে বাহিরে যাতায়াতের পথও ছিল, তাহা মহাভারতাদি পড়িলে জানা যায়; উহা ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল দিয়া ছিল। সভ্যতাদির বাহক "পথ"। পৃথিবীর ইতিহাস যাঁহারা ভালরূপে জানেন, তাঁহারা উহার সন্ধান দিলে ভাল হয়। পথ ছিল—যাতায়াতও ছিল।

ঐ পথ দিয়াই কালযবন ভারতের বাহির হইতে সুবৃহৎ (কথিত হয় এক কোটি) সৈন্যদল সহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধার্থ মথুরা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। অন্যান্য নানা জাতি ভারতীয় রাজশাসনে ভারত হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন; যযাতির বংশধরেরা তো ভারত হইতে বহিষ্কৃত হইয়া নানা পাশ্চাত্য জনপদে গিয়া তত্তদ্দেশের রাজা হইয়াছিলেন, ইহা সকলেরই সুবিদিত। তাহা কতক কুরুক্ষেত্রে প্রকাশিত "ভারতের হারাধন" প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, বাকী প্রবন্ধান্তরে দেখাইব।

"নানাকথায়" "রুষিয়া" শব্দ "উড়িষ্যা" হইতে, এই যে মত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা সম্ভব; কিন্তু উহা যাচাই করিয়া প্রমাণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি আবশ্যক :—

(১) পৃথিবীর তথা রুষিয়ার ও ভারতাদি দেশের পুরাতন মানচিত্রাবলী।

(২) রুষিয়া ও উড়িষ্যার গ্রাম্যকথা (folktales)।

(৩) রুষিয়া ও উড়িষ্যাদেশের গ্রামসকলের ও ডাকঘরের নামের তালিকা।

(৪) রুষিয়া ও উড়িষ্যার পুরাতন ইতিহাস।

(৫) ভারতীয় পবিত্র গ্রন্থাদি (Sacred Books) মহাভারত, পুরাণ, স্মৃত্যাদি; এই সকল খুঁজিয়া দেখিতে হইবে উড়িষ্যার কেহ ভারত হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন বা গিয়াছিলেন কি না? এবং যাইলে ভারতের বাহিরে কোথায় তাঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন—রুষিয়াতে কি না?

উক্ত গ্রন্থসকল মধ্যে যে জগতের নানা জাতি ও দেশের অধুনা অজ্ঞাত পুরাতন ইতিহাসের মালমসলা পাইয়াছি, তাহা আধুনিক কালের আবিষ্কারাদির সহ মিলাইলে ঐ সকল মালমসলারই প্রামাণ্য দৃষ্ট হইবে। যথাসাধ্য খাটিয়াছি ও খাটিতেছি; কিন্তু তৎসকল ঠিক-মত প্রচার করা একার সাধ্য নহে। ঐজন্য একটি প্রতিষ্ঠান আবশ্যক। দেশীয় কোন মহৎ ব্যক্তি এ বিষয়ে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন কি?

—

ব্রহ্ম-সঙ্গীত স্বরলিপি।

কীর্ত্তন দাদরা।

প্রভু করুণা কুরু কিঞ্চিত,
কৃপাভিখারী কাতর কিঙ্করে নাথ।
বড় আশা করে এসেছি নাথ।
[দেখা পাব ব'লে—ত্রাণ পাব ব'লে—চরণ পাব ব'লে]
আমি পাপেতে তাপিত হ'য়ে, আছি তব দ্বারে দাঁড়াইয়া।
[ওহে পতিতপাবন]

প্রভু স্থান দাও তব চরণতলে,
আমায় ত্যজ না পাতকী বলে,
[ওহে অধমতারণ]

প্রভু কৃপাসিন্ধু, সিন্ধু তব নাম,
আমায় কৃপাবারি কর হে দান।
[ওহে কৃপাময়]

কথা ও সুর—চিরঞ্জীব শর্ম্মা (৺ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল) স্বরলিপি—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

• ১ • ১ • ১
গমা ॥ মা পা পা। -া পা মা। পা ধা পা। মা গা মা। { মা পা পা। -া সা সা।
প্রভু ক রু ণা •কু রু কি ন চি ত প্র ভু { ক রু ণা • কৃ পা
ক রু ণা • ব ড়

• ১ • ১
সা রা রা। রা রা গা। মা পধা পা। মা গা মা। }
ভি খা রী কা ত র কিং • ক রে না থ
আ শা • ক • রে এ সে ছি না • থ }

• ১ • ১ • ১
{ র্সা র্সা না। র্সা না ধা। পা পা ধা। ধা -া না। } মা ধা পা। মা গা মা।
দে খা পা ব ব লে ব ড় আ শা • • — — — — — —
ত্রা ণ পা ব ব লে ব ড় আ শা • • — — — — — —
চ রণ পা ব ব লে ব ড় আ শা ক রে } এ সে ছি না - থ

• ১ • ১ •
পধা ।। না র্সা র্রা। র্গা র্রা র্সা। র্সা না ধা। না না না। র্সনা ধনা র্সনা।
আমি পা পে তে ০ • ০ তা - পি ত হ' য়ে এ— — —

১ • ১ • ১
ধপা পা পা। ধা ধা -া। ধা না র্সনধা। পা পা ধনধা। পা -া -া।
•০ আ ছি ত ব • দ্বা রে ০০• দাঁ ড়া ••০ ইয়া • •

• ১ • ১ •
ক্মা পা পা। -া র্সা র্সা। না র্সা র্সা। না ধা ধা। পা ধা ধা।
ক রু ণা • ও হে প তিত পা বন আ ছি • ত ব

১ • ১ • ১
ধা না র্সনধা। পা পা ধনধা। পা -া -া। ক্মা পা -া। -া -া -া ।।
দ্বা রে ০•• দাঁ ড়া ই০০ য়া ০ ০ ক রু ণা • কু রু

• ১ • ১ • ১
পধা ।। না র্সা র্রা। র্গা র্রা র্সা। -া -া -া। -া র্সা র্সা। ধা না না। না র্সা -া।
প্রভু দা ন • দা • ও • • ০ ০ ত ব চ র ণ ত লে •
প্রভু কৃ পা • সি ন ধু • ০ • • সি দ্ধু ত ব • না ০ ম

• ১ • ১ • ১
ধনা ধনা র্সা। -া না ধপা। ধা ধা -া। ধা না পা। না ধা -া। পা -া -া।
— — — • আ মা য় ত্য জ • না • পা ত • কী ব • লে
— — — • আ মা য় কৃ পা০ বা ০ রি ক র হে দা • ন

"[ওহে অধম তারণ]" "[ওহে কৃপাময়]" এই দুইটী আথর
"[ওহে পতিত পাবন]" এই আথরের ন্যায় গেয়।

———

নানা কথা।

দ্রৌপদীর বিবাহ—শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ সিংহ দ্রৌপদীর বিবাহবিষয়ক যে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে যে প্রকার আলোচনা চলিতেছে, তাহাতে বুঝিতেছি উহা পাঠকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। প্রবন্ধটী ঐতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ বলিয়াই আমরা উহা প্রকাশ করিয়াছি এবং ঐতিহাসিক দিক দিয়া এবিষয়ে যিনি যাহা লিখিয়াছেন, আমরা নিরপেক্ষ ভাবে তাহা প্রকাশ করিতেছি। জনৈক পাঠক কিন্তু এরূপ আলোচনার বিরুদ্ধে আমাদিগকে এক পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার পত্র পড়িয়া মনে হয় যে, তিনি মনে করেন যে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কেবল ধর্ম্ম ও দর্শনের "তত্ত্বে" পরিপূর্ণ থাকা উচিত। আমরা কিন্তু তাহা মনে করি না। তিনি যদি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা অবধি পড়িয়া দেখেন তো দেখিবেন যে, ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি (কামভাবোদ্দীপক উপন্যাসাদি বিষয় ব্যতীত) সকল বিষয় সংগত ভাবে ও সংযত ভাষায় আলোচিত হইয়া আসিতেছে। প্রকৃতই, আমাদের জানা উচিত যে আমাদের দেশে ইতিহাস, ধর্ম্ম ও দর্শন এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বদ্ধ যে, উহার কোন একটীর আলোচনা স্থগিত রাখিলে অন্য দুইটার প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। পত্রপ্রেরকের যুক্তিতে দেশের উপধর্ম্ম বিষয়ক (এমন কি ভৈরবী চক্র প্রভৃতি) কোনও কিছুরই আলোচনা সম্ভব হয় না। কিন্তু ইহা জানা কথা যে, পত্রিকায় সেই আদিমকালে, যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইহার হাল ধরিয়াছিলেন, তখন অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই সকল বিষয় পত্রিকায় প্রকাশ করিবার ফলে হিন্দুসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ প্রকার বিষয়সকল নির্ভীক ভাবে প্রকাশ করায় দেশ কুসংস্কার হইতে অনেকাংশে মুক্তি লাভ করিয়াছে।

তাঁহার দ্বিতীয় কথা এই যে, ইহাতে দ্রৌপদীর নিন্দা করিয়া হিন্দুজাতির মনে আঘাত দেওয়া হইয়াছে। আমার মনে হয় না যে, উদারপ্রাণ বিরাটহৃদয় হিন্দু জাতি এত সূক্ষ্মচর্ম্মী যে, মহাভারতের বা কোনও শাস্ত্রের কোনও বিষয় ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে তাহার আঘাতে মৃতপ্রায় হইবে। তাহা যদি হইত, তবে বেদব্যাস নিজের জন্মকথা এবং কুন্তী অহল্যা প্রভৃতির আচার ব্যবহারের কথা কোন অংশ না লুকাইয়া নগ্নমূর্ত্তিতে প্রকাশ করিতে সাহস করিতেন না। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠির ব্যতীত অন্যান্য পাণ্ডবের বিবাহিত পত্নী না হওয়া যদিবা প্রমাণিত হয়, তাহাতেও তাঁহার গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না। আশ্চর্য্য এই যে, যে "পঞ্চ কন্যা" নিত্য স্মরণীয়, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ব্যবহারে গুরুতর দোষ উল্লিখিত দেখা যায়। কাজেই বুঝিতে হইবে, ঐ প্রকার ব্যবহার সত্ত্বেও অন্যান্য গুণের কারণে তাঁহারা প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। আমরা প্রেমানন্দ বাবুকে, দোষ সত্ত্বেও প্রাতঃস্মরণীয় হইবার কারণ বিষয়ে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছি এবং তিনিও সে বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। পত্রপ্রেরককে আমরা জোরের সঙ্গে বলিতে পারি যে, কাহারও (পৌরাণিক character হৌন বা জীবিত নরনারী হৌন) নিন্দা পত্রিকায় স্থান পাইবে না এবং Trustdeed এর বিরুদ্ধ কোন আলোচনাও প্রকাশিত হইবে না। তাঁহাকে এটুকুও বলিয়া রাখিতেছি যে বেদী হইতে ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ এবং মাসিকপত্রে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা, উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ।

পর্দ্দার বিরুদ্ধে—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, শেষে বড়বাজারের মাড়োয়াড়ী মহিলাগণও অস্বাভাবিক পর্দ্দাপ্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। আমরা মঙ্গলজনক পর্দ্দা-প্রথার বিরোধী নহি, কিন্তু অমঙ্গলের নিদান অস্বাভাবিক পর্দ্দা-প্রথার বিরোধী। একবার গাজিপুরে যাই। সেখানে ষ্টীমারঘাট হইতে সহরের পথে পড়িবার মধ্যস্থলে গঙ্গার চড়া সিকি মাইল আন্দাজ পার হইতে হয়। দেখিলাম, বাঙ্গালী মহিলাগণ এবং মাড়োয়াড়ি মহিলাগণ সকলেই "ঘেরাটোপ" ওয়ালা পাল্কী চড়িয়া ঐটুকু পার হইতেছেন; কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, উহা না করিলে নাকি সম্মান বজায় থাকে না। প্রথম প্রথম বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত মহিলারাই ঐ প্রথা প্রবর্ত্তন করেন; তখন তাঁহাদের দেখাদেখি অন্যান্য জাতির মহিলাগণও ঐ প্রথার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। "ঘেরাটোপ" কাহাকে বলে, তাহা হয় তো আজকালকার অনেকে জানেন না। বালিশের যেমন খোল বা ওয়াড় থাকে, ইহাও সেইরূপ সমগ্র পাল্কীর খোল বা ওয়াড়—যাহাতে উহার ভিতরের মহিলা বাহিরের কাহাকেও দেখিতে না পান, এবং বাহিরের কোনও লোক তাঁহাকে দেখিতে না পান। এখন হয় তো ইহা একটু আশ্চর্য্যের বিষয় এবং দু-দণ্ড চাহিয়া দেখিবার বস্তু বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু সেকালে ইহাই প্রথা ছিল। আমরা দেখিয়াছি আমাদের বাড়ীর মহিলারা একেবারে সংলগ্ন পার্শ্ববর্ত্তী আত্মীয়ের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন এইরূপ ঘেরাটোপ পাল্কীর সাহায্যে এবং সঙ্গে দরওয়ান, চাকর ও দাসী—যেন মহিলা কোন্ সুদূর বিদেশে যাত্রা করিতেছেন।

এই প্রকার পর্দ্দা হইল অতিরিক্ত পর্দ্দা—পর্দ্দার বাড়া-

বাড়ি। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ভীষণ ভূমিকম্প হয়। আমরা ছেলে-মেয়ে সকলে বাড়ীর খোলা বাগানে আসিয়া দাঁড়াইলাম। পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর ছেলেরা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া খোলা জায়গায় দাঁড়াইলেন, কিন্তু মেয়েরা ঐ অতিরিক্ত পর্দ্দার প্রভাবে কেহই বাহির হইলেন না! আমরা বাল্যকালে যেরূপ পর্দ্দার ব্যবহার দেখিয়াছি, আজ-কালকার দুর্মূল্যতা প্রভৃতির দিনে তাহা অব্যাহত থাকিলে যক্ষ্মার প্রাবল্যে নিশ্চয়ই দেশের মেয়েরা এবং সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরাও যে decimated হইয়া যাইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভগবানের বিধানেই প্রকৃতির নিয়মের ফলেই বর্ত্তমানে আত্মরক্ষার জন্য পর্দ্দার বিরুদ্ধে অভিযান চলিতেছে। আমরা অতিরিক্ত পর্দ্দারও পক্ষপাতী নহি, আর অতিরিক্ত বে-পর্দ্দারও সপক্ষ নহি। আমি 'আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা' গ্রন্থে দেখাইয়াছি যে, বৈদিক কালে স্বাধীনতার সহিত পর্দ্দা-প্রথা বা অবরোধপ্রথার কিরূপ সামঞ্জস্যের সঙ্গে সংমিশ্রণ ছিল। আমরা সেইরূপ অবরোধ প্রথারই পক্ষপাতী। যাঁহারা ভদ্র ইংরাজ পরিবারে ঘনিষ্টভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহারাই আমার এই কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন নিঃসন্দেহ। কিন্তু ইহাও ঠিক, পর্দ্দাপ্রথার অস্তিত্বের সময়ে যেভাবে সমাজের গতি চলিতেছিল সেভাবে চলিবে না—বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট অন্য কোন পথে চলিবে। কিন্তু তাহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই।

দীর্ঘায়ু পুরুষ—সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত আলারাম ১২৮ বৎসর বয়সে সিন্ধু—হায়দ্রাবাদে গত ২২শে নবেম্বরে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি সনাতন ধর্ম্মের প্রচারক হিসাবে অনেক দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়া-ছিলেন।

দেবমন্দিরে প্রবেশাধিকার— দেবমন্দিরে নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের প্রবেশাধিকার লইয়া চারিদিকে মহা কোলাহল উঠিয়াছে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, এই অধিকার দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে এবং তাহা সামান্য হইলেও সফলতা লাভ করিতেছে। কিন্তু আজ যে অধিকার দেওয়া হইতেছে, কাল সুবিধা হইলেই তাহা কাড়িয়া লইতে কতক্ষণ? এই অন্যায় প্রথার প্রতীকারের একমাত্র উপায় অসাম্প্র-দায়িক সত্যধর্ম্ম অবলম্বন; এই সত্যধর্ম্মের নিকট উচ্চ-নীচ ভেদের কারণে অস্পৃশ্যতা প্রভৃতির কথাই উঠিতে পারে না।

কাফিরিস্থান—আফগানস্থানের অন্তর্ভুক্ত বলি-লেও চলে। ইহার অধিবাসীরা সাধারণত কঠোর পরিশ্রমী ও দুর্দ্ধর্ষ। কাহারও নিকটে ইহারা সহজে মাথা নত করিতে চাহে না। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কাবুলের আমীর ইহাদিগকে বশে আনেন। ইহাদিগকে অধীনে আনিবার পর ঐ প্রদেশে মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। কাফিরিগণও দলে দলে সভ্য হওয়ার মানসে ইসলামধর্ম্মে নাম লিখাইতে থাকে। এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণের সঙ্গে তাহাদের আচারব্যবহারেও অনেক পরিবর্ত্তন হইতেছে। সম্প্রতি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ঐ দেশে এক বৈজ্ঞানিক অভিযান প্রেরণ করেন। অভি-যাত্রীগণ বলেন যে কাফিরিদিগকে জাতি হিসাবে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—সিয়াপোষ এবং সফেদপোষ; গোত্র হিসাবে আরও অনেক ভাগ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক গোত্রই ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, তথাপি এক গোত্রের লোক অন্য গোত্রের ভাষা বুঝিতে পারে। ঐ সমস্ত ভাষারই জন্ম ভারতের "প্রাকৃত" হইতে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহারা পৌত্তলিক—মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে; অনেক গাছ ও জীবজন্তু তাহাদের চক্ষে পবিত্র। আচারব্যবহারে পৌরোহিত্য-প্রথা ও নৃত্যগীতের বাহুল্য সহজেই চক্ষে পড়ে। ইহাদের শারীরিক গঠন—ঋজু ও পাতলা, দৈর্ঘ্যে সাধারণত প্রায় সাড়ে পাঁচফুট। হাঁটিতে ক্লান্ত হয় না; পাহাড়ে উঠিতে ইহাদের সমকক্ষ কেহ নাই। পোষাক পরিচ্ছদে বহুকাল যাবৎ জঙ্গলীই ছিল, মাত্র দুই চার বৎসর তাহারা তুলার প্রস্তুত কাপড় ব্যবহার করিতেছে।

ঘোড়দৌড়ে জুয়াখেলা—নাঃ— ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলাকে জুয়াখেলা বলিবার অধিকার তোমারও নাই, আমারও নাই, কাহারও নাই। তুলার খেলা জুয়া-খেলা; বৃষ্টির খেলা জুয়াখেলা; আর সব জিনিষেরই খেলা জুয়াখেলা; কেবল ঘোড়ার খেলা জুয়াখেলা হইতেই পারে না। কারণ, অন্যান্য জিনিষ লইয়া অন্তত এদেশে প্রধানত শুধু দেশীয় লোকদিগকেই খেলিতে দেখা যায়, কিন্তু ঘোড়দৌড়ের খেলা ধনী লোকেরাই, বিশেষত ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়েরাই প্রধানত খেলে। কাজেই আর সকল খেলায় ধরপাকড়ের জন্যই আইনকানুনের ব্যবস্থা হইল; কিন্তু ঘোড়দৌড়ের খেলা আইনের হাত হইতে বাঁচিয়া গেল। জুয়াখেলা মাত্রেই যে কি রকম নেশা চাপে এবং কি রকম সর্ব্বনাশ হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেরই প্রত্যক্ষ হইয়াছে। একবার আমি খিদিরপুর হইতে ট্রামে ধর্ম্মতলায় আসিতেছিলাম। গাড়ী একেবারে লোকে বোঝাই—তাহার মধ্যে অনেকেই ঘোড়দৌড়ের ফেরত। তাহা-দের মধ্যে একটী ১২।১৪ বৎসরের মাড়োয়াড়ি বালক ছিল। সে গাড়ীতে উঠিয়া অবধি পাগলের মত "এক রুপেয়ামে দশ রুপেয়া মিলা" বকিতে বকিতে দুই পা

দুই হাত তুলিয়া নাচিতে লাগিল। আমার এক হিন্দুস্থানী বন্ধু একবার ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলায় কুড়ি হাজার টাকা লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমটা তিনি লোভ সামলাইয়া ঐ খেলা হইতে কিছুকালের জন্য নিবৃত্ত হইলেন এবং বুদ্ধিমানের মত একটা কাপড়ের দোকান খুলিয়া বেশ দু-পয়সা লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ কিছুকাল পরে সঙ্গীদের পাল্লায় পড়িয়া আবার প্রলোভনে পড়িলেন এবং পুনরায় জুয়াখেলাতে নামিয়া প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা লোকসান দিলেন। পূর্ব্বকার লাভ কুড়ি হাজার তো গেলই; তাহার উপর দোকান হইতে পুঁজি ভাঙ্গিয়া দশ হাজার গুনোগার দিতে হইল। কাজেই মূল ধনের অভাবে দোকানও টলমল করিতেছে। কত দৃষ্টান্ত দিব? আর একটি পরিচিত মাড়োয়াড়ী তিন লক্ষ টাকা ঘোড়দৌড়ে পাইয়া ছয় মাসের মধ্যে ঘোড়দৌড়েই সমস্ত উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু মাড়োয়াড়ী প্রভৃতি ভারতের ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা গর্ব্ব করে যে, 'আমরা লোটা আর সোটা ও কম্বল অর্থাৎ একটা জলপাত্র, একখণ্ড যষ্টি ও একটা মুড়ি দিয়া শুইবার কম্বল লইয়া আসিয়াছি, যদি অদৃষ্ট মন্দ হয়, তবে তাহা লইয়াই দেশে ফিরিব; ইহার বেশী তো আর কিছু হইবেনা, তখন জুয়াখেলার দ্বারা টাকা রোজগার করিতে থামিব কেন? আমাদের বুকের পাটা বাঙ্গালীদের অপেক্ষা অনেক মজবুত।' প্রকৃতই, আমাদের দেশ এখানে বলিয়া, আমাদের স্ত্রীপুত্রাদি সকলেই এখানে বলিয়া আমাদের বুকে অত জোর আসে না। আমার তো চক্ষে ভাসিতেছে—দুই তিন জন জমিদার ঘোড়দৌড়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইতে বসিয়াছে। অন্যান্য বিলাতী নেশা ও পাপের ন্যায় এই পাপও দেশের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে; এমন কি, আজকাল সভ্যতাভিমানী অনেক দেশীয় মহিলাও এই জুয়াখেলার পথে ভিড়িয়াছেন! হে ভগবান! কবে এই সকল পাপ হইতে দেশ মুক্তি লাভ করিবে?

গত ২১শে কার্ত্তিকের সঞ্জীবনীতে দেখি, মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল পাশ হওয়ায় সহরের মধ্যে ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলার টিকিট বিক্রয়ের আড্ডা উঠিয়া যাইবে। সঞ্জীবনীর সঙ্গে আমরাও বলি যে, ইহা মন্দের ভাল বা ভালর সূত্রপাত। কিন্তু কথা এই যে, যে পরিমাণ টিকিট বিক্রয় হয়, তাহার কতটুকু সহরের মধ্যে হয়, আর কতটা ঘোড়দৌড়ের মাঠে হয়। সর্ব্ববিধ জুয়াখেলার পাপ সমূলে উৎপাটন করাই সমাজনীতির ন্যায় রাষ্ট্রনীতিরও কর্ত্তব্য। সমাজের দারিদ্র্যের কারণে অনেক দরিদ্র মধ্যবিত্ত লোকও বিনা পরিশ্রমে হঠাৎ-নবাব হইবার জন্য অন্যান্য জুয়াখেলায় জেলে যাইবার ভয়ে এই ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলাতেই ডুবিয়া যায়। সকলের জানা উচিত, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রোজগার না করিলে টাকা লাভ করিলেও থাকে না।

ইহার উপর আজকাল একটা ফ্যাষন হইতেছে, ভাল প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাইতে হইবে, হয় বারাঙ্গনাপরিচালিত থিয়েটরে অভিনয় করাইয়া অথবা দিগ্বিদিক জ্ঞানরহিত হইয়া, অপরের ইষ্টানিষ্টের প্রতি দৃষ্টিহীন হইয়া, মহিলানৃত্য করাইয়া অথবা Turf clubএর কর্ত্তৃপক্ষদের নিকটে ভিক্ষার ঝুলি পাতিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে! ইহার ফলে কি দুর্নীতিপরতা, অদ্ভুত কি নীতিহীনতা যে দেশের অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করিতেছে, তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

বায়স্কোপ—২১শে কার্ত্তিকের সঞ্জীবনীতে দেখি, জেনেভার জাতিসঙ্ঘের সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে উক্ত সঙ্ঘের শিশুমঙ্গল কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, বালক-বালিকাদিগকে সিনেমা দেখিতে দেওয়া উচিত নহে। প্রকৃতই সিনেমাতে যে সকল প্রেমচিত্র দেখানো হয়, এবং প্রেমচিত্রই বোধ হয় সিনেমায় শতকরা ৯০ ভাগের উপর, তাহার ফলে বালকবালিকাদের অন্তঃকরণে সর্ব্বনাশের কিরূপ উপায় অঙ্কিত হয়, তাহা ঐ সকল প্রেমচিত্র না দেখিলে বোঝা যাইবে না। যাই হোক, দাসমনোভাবের কারণে আমরা যখন বিলাতী ফ্যাষণের দাস হইয়াছি, তখন আশা হয় এই বিলাতী জাতি-সঙ্ঘের অনুশাসনে আমাদের দেশের অনেকে তাঁহাদের ছেলেমেয়েদিগকে এখন অবধি সিনেমাতে লইয়া যাওয়া হইতে নিবৃত্ত হইবেন।

ভারতবাসীর দারিদ্র্য—কি উপহাসের কথা—ভারতের শ্রমজীবিদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য আবার রয়াল কমিশন বসাইতে হয়! চক্ষু থাকিলে পথে চলিতে চলিতেই পথিক দেখিতে পাইবে যে, ভারত-বাসীর দারিদ্র্য কত গভীর। মনে হয় পড়িয়াছিলাম যে, ভারতবাসীর গড়ে বাৎসরিক আয় ২০৲ টাকা অর্থাৎ মাসে প্রায় ১৸০ টাকা; সেই দুই টাকার ন্যূন আয়ে তাহাদের ৪।৫টী লোকের এক একটী পরিবার পুষিতে হয়। যাহাদের বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা না হয় বিশ্বাস করিবেন না; কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জানি যে, মফঃস্বলের প্রজাদের অনেকেই সাধারণত দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না—গবর্ণমেন্টের খাসমহলের প্রজারাও শতবিধ খাজনার ভয়ে নিষ্পিষ্ট হইয়া মৃত-প্রায় হইয়া থাকে। এই কারণেই উহাদিগকে যাঁহারা খাজনা কমাইবার আশ্বাস দেন, দুমুঠো ভাত পেট ভরিয়া খাইতে দিবার আশ্বাস দেন, উহারা তাঁহা-দিগেরই গোলাম হইয়া যায়। ইহার উপর, দুর্ভিক্ষ

অজন্মা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতির একটা না একটা বৎসরের পর বৎসর তো লাগিয়াই আছে। উহারই মধ্যে বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির ভিতর কোন একটা বিশেষ ভাবে লাগিলেই শেষ হইয়া গেল—হাজার হাজার লোক দুর্ভিক্ষরাক্ষসের চরণে তাহার অনুচর মহামারী প্রভৃতির খাঁড়ার প্রহারে বলি প্রদত্ত হইবার পর, তবে আবার পূর্ব্বের সাম্যভাব কতকটা ফিরিয়া আসে। দুর্ভিক্ষে প্রজাগণের অবস্থা আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছে—যুবক বালকেরা তো কোন প্রকারে শতচ্ছিদ্র বস্ত্র পরিয়া চলাফেরা করিতে পারে, কিন্তু যুবতী রমণীরা বস্ত্রাভাবে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় ক্ষুধাশান্তির জন্য বিষাক্ত শাক কুড়াইতেছে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এমনও সম্বাদ কানে আসিয়াছিল যে, বস্ত্রাভাবে ভদ্রপরিবারের কোন কোন রমণী গৃহের বাহিরে আসিতে অক্ষম হইয়া নীরবে মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অন্নবস্ত্রের অভাবের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এই তো আজ কয়েক দিন কুমিল্লার অঞ্চলে বন্যার ফলে দুর্ভিক্ষের কারণে অন্নাভাবে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত সুরু হইয়াছে।

গত ২১শে কার্ত্তিকের সঞ্জীবনীতে দেখিলাম, শ্রমজীবীদের অবস্থা দেখিবার জন্য বিলাতের নিযুক্ত রয়াল কমিশন দিল্লীতে দুইটী স্ত্রীলোক মজুরনী এবং একজন পুরুষ রাজমিস্ত্রীকে ডাকিয়া তাহাদের সংসারের বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে তাহারা বলে যে, তাহাদের প্রত্যেকেরই ২০০৲ ঋণ আছে, তজ্জন্য শতকরা ৩৭॥ টাকা হিসাবে সুদ দিতে হয়। তাহারা যাহা পায় তাহাতে কোন প্রকারে দিন গুজরাণ হয়। কমিশনের কোন সভ্য জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহারা দুধ ঘি খায় কি না। শ্রমজীবীরা বলে—দুধ ঘি খাইবার পয়সা তাহারা পাইবে কোথায়? স্ত্রীলোকেরা বলে, তাহারা প্রত্যেকে সাত আনা মজুরী পায়; তাহাদের সংসারের পাঁচটী প্রাণী—সাত আনায় পাঁচজনের অন্নবস্ত্রের অভাব দূর করিতে হয়! দুঃখের বিষয়, এই সহজ তথ্য সন্ধানের জন্য ভারতে বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া রয়াল কমিশন বসাইতে হইল। এত কমিটি কমিশন ইতিপূর্ব্বে বসিয়া গিয়াছে, এবং তাহাদের তদন্তের ফলে দেশের অভাব এত সামান্য নিরাকৃত হইয়াছে যে, কমিটী কমিশনের উপর দেশবাসীর আস্থা বড়ই কমিয়া গিয়াছে। আসল কথা এই যে, ইংরেজ জাতি নিজেদের স্বার্থ অল্প-বিস্তর ত্যাগ করিয়া, দেশের খাজনার ভার কমাইয়া দিয়া, চাউল প্রভৃতি অপরিহার্য্য আহার্য্যের রপ্তানি বন্ধ করিয়া দেশবাসীর অন্নবস্ত্রের সংস্থান স্থায়ীভাবে সুলভ করিয়া না দিলে আশঙ্কা হয়, দেশ জগতের ইতিহাসপ্রদর্শিত পথের অনুসরণ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। অন্নবস্ত্র সুলভ কর, বৈপ্লবিক ভাব সহজেই অন্তর্হিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, আমরা বিপ্লবপন্থার আদৌ পক্ষপাতী নহি। যে সেটেলমেণ্ট চলিতেছে, তাহার ফলে গবর্ণমেণ্টের খাসমহলে বর্ত্তমান শতকরা প্রায় ৫০৲ টাকার উপর আরও ২৫৲ টাকা বৃদ্ধি হইতেছে এবং জমীদারী মহলেও সেসের নামে প্রকারান্তরে খাজনা বৃদ্ধি হইতেছে শোনা যায়। এই সেদিন সংবাদপত্রে পড়িলাম যে সুন্দরবন অঞ্চলে খাসমহলের খাজানা অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হইতে চলিয়াছে। মানুষ মানুষ তো বটে—অতিরিক্ত চাপের প্রয়োগে মানুষের প্রাণ যখন ফাটিয়া বাহির হইবে, তখন তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখা নিতান্তই অসাধ্য হইবে।

হিন্দুর কর্ত্তব্য—এখনও যাঁহারা প্রতিপদে সমাজ-সংস্কারে ভয়ত্রস্ত হইয়া উঠেন, তাঁহাদিগকে আমরা দূরদর্শী বলিতে পারি না। অতীতের ধারার সহিত সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যুগে যুগে যুগধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হওয়া প্রত্যেক দেশের ও প্রত্যেক জাতির মহাপুরুষের লক্ষণ। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের ও হিন্দুজাতিরও এই নীতি অনুসরণে অবিলম্বে সমাজসংস্কারে উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত—নতুবা হিন্দু-জাতিকে, সুতরাং তাহার cultureকে রক্ষা করিবার কথা বলা বাতুলের প্রলাপ মাত্র। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রই তো প্রতিদিন সংবাদপত্র খুলিলেই দেখিতে পাইবেন যে, কিরূপ দ্রুতগতিতে হিন্দুজাতি ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। বড়ই শুভক্ষণে কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "হিন্দুজাতি ধ্বংসোন্মুখ কি না" গ্রন্থে আমাদের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন।

সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় শ্রীহট্টে একটী বক্তৃতায় ঠিক কথা বলিয়াছেন—"হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনকে আশ্চর্য্যরূপে নিজের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে পারে।" ঠিক কথা; ইহার কারণ এই যে, হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্র একমাত্র ভগবান, যিনি সকল দেশে সকল জাতিতে ও সর্ব্বকালে সমভাবে বিদ্যমান। কিন্তু হিন্দুসমাজ কালক্রমে আপনাকে অতিরিক্ত গণ্ডীবদ্ধ করিয়া কূপমণ্ডুকের মত বাস করিবার ফলে এই বিশাল বিরাট শক্তি হইতে বিচ্যুত হইতে চলিয়াছে। কোন ব্যক্তির পান হইতে চুনটী খসিল, বিশেষত যদি সে স্ত্রীলোক হয়, অমনি তাহাকে সমাজ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। বর্ত্তমানে বিশ্লেষণের বেলায় সমাজ বড়ই পটু, বড়ই active; কিন্তু আশ্লেষণের বেলায়, লোকসংগ্রহ করিয়া সমাজকে পুষ্ট করিবার বেলায়, সমাজ পেচকের ন্যায় নীরব ও গম্ভীর। এই সময়ে সমাজের এপ্রকার

ব্যবহার প্রকাশ পায়, যেন সমাজের ঐ কয়েকজন তথাকথিত নেতার ন্যায় আর কেহই সমাজের মঙ্গল বুঝিতে পারেন না। কাজেই সমাজ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে চলিয়াছে।

এখনেও দাসমনোভাবের ক্রিয়া খুবই দেখা যায়। ঐ যে সাহেবেরা, বিশেষত মিসনরি সাহেবেরা কেতাবে বলিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্ম তাঁহাদের মতে non-missionery ধর্ম্ম অর্থাৎ আশ্লেষণপ্রধান না হইয়া বিশ্লেষণপ্রধান ধর্ম্ম; অতএব হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা ও হিন্দুসমাজের নেতারা রায় দিলেন, তোমরা সমাজের মধ্যে বাহির হইতে লোক লইতে পার না, কিন্তু কথায় কথায় পদে পদে ঘরের লোককে পর করিয়া বাহির করিয়া দিতে পার। অমনি পাদুকাবাহী আমরাও সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিলাম—'তা বটেই তো, তা বটেই তো"; এবং সেইমত কাজ করিয়া সকল দিকে দুর্ব্বল হইয়া পাদুকাবাহীত্বের উপরে উঠিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিলাম। ইহার প্রতিকারের উপায় হইতেছে বিশ্লেষণের চেষ্টা কমাইয়া আশ্লেষণের শক্তি বৃদ্ধি করা। আদি ব্রাহ্মসমাজ এই নীতির অনুসরণচেষ্টার পথপ্রদর্শক। আদিসমাজই শুদ্ধিবিষয়ে সর্ব্বপ্রথম পথ দেখাইয়াছেন; আদিসমাজের তত্ত্বাবধানেই হিন্দুসমাজের সকল দিকে অনন্যপূর্ব্ব শ্রেষ্ঠতাবিষয়ক বক্তৃতা দেওয়ানো হইয়াছিল। এই যে বাল্যবিবাহ নিরোধ বিষয়ক আইন হইল, আদিসমাজ এপ্রকার আইনের দ্বারা, বিশেষত বিদেশীদিগের সাহায্যে সমাজসংস্কারের চিরকাল বিরোধী হইলেও বাল্যবিবাহ নিরোধ বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। এবিষয়ে আমরা তর্কভূষণ মহাশয়কে সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি—"সামাজিক ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপে আপত্তির একটা যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু যৌবনপ্রাপ্তির পূর্ব্বে বিবাহপ্রথা অব্যাহত রাখার দাবীর পশ্চাতে কোনই যুক্তি নাই। সামাজিক সমস্যা সমাধানের ভার কতিপয় পণ্ডিতের হাতে ছাড়িয়া না দিয়া সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিমণ্ডলীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য, এবং পুরাকালেও তাহাই করা হইত।" যে দূরদর্শী নীতিদৃষ্টিতে ঋষিরা অষ্টপ্রকার বিবাহ এবং দ্বাদশপ্রকার পুত্রকে যেভাবেই হউক সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন, সেই নীতি আমাদেরও অনুসরণ করা কর্ত্তব্য—অনাহারে অনশনে, পুষ্টির অভাবে সমাজকে মৃত্যুর পথে লইয়া গেলে কোনই লাভ নাই, বিপরীতে সমূহ ক্ষতি।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র—সংবাদপত্রে দেখিয়া সুখী হইলাম যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ সম্বন্ধে নানা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি ইংরাজীতে তাঁহার সমস্ত পরিশ্রমের ফল প্রকাশ করিয়া ইংরাজের সুবিধা করিতেছেন; বাঙ্গালীর তাহাতে বিশেষ উপকার হইল কি? বাংলাভাষা তাহাতে পুষ্টিলাভ কি করিল? তাঁহার বহু কৃতী ছাত্র থাকাতেও বাংলাভাষায় তাঁহার কার্য্যবিবরণ প্রকাশ করিবার চেষ্টা না করায় আমাদের পরিতাপের সীমা নাই। বাংলাভাষায় কিছু প্রকাশ হইয়াছে কি না আমরা জানি না, অন্তত আমাদের দৃষ্টিতে এপর্য্যন্ত আসে নাই। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের নিকট এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের গবেষণার ফল ও কার্য্যবিবরণ বাংলা ভাষাতেও প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষাকে কিছু পুষ্ট করিয়া তুলুন। একথা বলিলে হইবে না যে, বাংলা ভাষায় উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দ নাই। আমরা তো তাই আরও চাই যে বাঙ্গালী বিজ্ঞানবিৎদিগের চেষ্টায় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের পরিভাষা দাঁড়াইয়া যাইবে। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি তত্ত্ববোধিনীতে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধসকল বাংলায় না লিখিতেন এবং যথাকালে সেগুলি গ্রন্থাকারে না প্রকাশ করিতেন, তবে আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে বঙ্গদেশে বিজ্ঞানচর্চ্চা আরও অনেক বৎসর পিছাইয়া পড়িত। পরিভাষা প্রস্তুত করিতে হইবে।

রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্ম—রাষ্ট্রনীতিতেও যে ধর্ম্মের শাসন আবশ্যক, ধর্ম্মের দ্বারা রাষ্ট্রনীতি নিয়মিত করা উচিত, পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাষ্ট্রসমূহের পতন ও বর্ত্তমানে ভারতের ইংরাজশাসন তাহার সাক্ষী। আমরা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের কথা এই আলোচনার আমলে আনিতে চাই না। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের সেই সুপ্রসিদ্ধ সিপাহিবিদ্রোহের পর যখন ভারতশাসন মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, সেই সময়ে এক ঘোষণাপত্র জারি করেন। সেই ঘোষণাপত্রকে, বলিতে কি, তদানীন্তন ভারতবাসীরা সাম্য ও মৈত্রীর এক সুমহান দানপত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতে ভারতবাসীর সহিত ইংরাজের সমান ব্যবহার, রাজকীয় উচ্চপদে জাতিনির্ব্বিচারে ইংরাজ ও ভারতবাসীকে যোগ্যতা অনুসারে নিয়োগের ব্যবস্থা, এবং আরও কত কি উচ্চদরের ধর্ম্মশাসিত রাষ্ট্রনীতির কথা উল্লিখিত ছিল। অধিকাংশ লোক, যাঁহারা আপনাদিগকে রাজনীতিতে সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের ধারণাই এই যে, রাজনীতির মূল মন্ত্রই হইতেছে প্রতারণা—পেটে থাকিবে এক কথা, মুখে বলিব আর এক কথা; মুখে বলিব এক কথা, কাজে করিব আর এক কথা। তাঁহারা তখন বুঝিতে পারেন না যে, পরকে প্রতারণার পরিণাম আত্মপ্রতারণা। ধর্ম্মের কল যে বাতাসে নড়ে,

একথা তাঁহারা মনে আনিতেই চান না। মনকে স্তোক দিয়া রাখিতে চান যে, উপায় যাহাই অবলম্বিত হৌক না কেন, পরিণাম-ফল ভাল হইলেই হইল। তোমার অনিষ্ট করিয়া আমার ভাল হইবে, অথবা আমার অনিষ্ট করিয়া তোমার ভাল হইবে, সে সমস্ত বিচার করিবার অবসরই আসে না। তাঁহাদের প্রাণের কথা,—the end justifies the means। ধর্ম্মনীতি বলে তাহা ঠিক নয়—উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকিবে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল এবং তাহার সাধনে ধর্ম্ম্য উপায়সকলই অবলম্বন করিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রকারের কূট রাজনীতিজ্ঞদিগের নানা কার্য্যের ফলে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঐ ঘোষণাপত্র অনেকাংশে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সে দিন এক সম্বাদ-পত্রে দেখিলাম যে, এক বড়লাট এক সরকারী পত্রে ঐ ঘোষণাপত্রের ফলে ভারতবাসীর অন্তরে সমুদিত আশাভরসা উপলক্ষ্য করিয়া লিখিতেছেন যে, "উহা-দিগকে স্পষ্ট নিষেধ করা এবং প্রতারণা করা, এই উভয়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম সরল পথ আমাদের ধরিতে হইবে"। ইহাই তো, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে, এই সত্যের সাক্ষ্য দিতেছে, নচেৎ অমন চিঠি প্রকাশিত হইবার প্রয়োজন ও অবসরই আসিত না। যাই হৌক, মনে ও মুখে এবং মুখে ও কাজে ঘোরতর পার্থক্য না থাকিলে আজ বড়লাটের ঘোষণাপত্র সম্বন্ধে বিশ্বাস করিব কি করিব না, এই প্রশ্ন উঠিতেই পারিত না; ভারতের রাষ্ট্রনীতি ধর্ম্মনীতির শাসন মানিয়া চলিলে আজ ১৫০ বৎসরের অধিক কালের আটেঘাটে বাঁধা শাসনের পরেও বিপ্লববাদ ভারতের ত্রিসীমানায় পদার্পণই করিতে পারিত না বলিয়া আমাদের নিঃসংশয় ধারণা। ভারতশাসনের এমন এক সময় আসিয়াছে, যখন ইহার রাষ্ট্রনীতিকে ধর্ম্মনীতির উপর নূতনভাবে গাঁথিয়া তোলা উচিত, ইহার শাসনকার্য্যের সমস্ত বিভাগ পেটে, মুখে, মনে ও কাজে এক করিয়া তোলা উচিত। এই ভাবে ভারতের ৩৩ কোটী প্রজার উপর ব্যবহার করিলে, কি বহিঃশত্রু কি অন্তঃশত্রু, ইংরাজদিগকে এদেশ হইতে হটাইবার কাহারও সাধ্য থাকিবে না। শাসননীতির পরিবর্ত্তন করিবার এমন সুযোগ হেলায় হারানো উচিত নহে।

অসাম্প্রদায়িক-পত্র 'মেসেজ'—ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার উদ্দেশ্যে সদানন্দ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস মহাশয় যুক্ত-প্রদেশ গোরক্ষপুর নামক স্থানে একটি অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্ম-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রায় ২৫০০৲ টাকা খরচ করিয়া প্রচারের সাহায্যার্থে একটি ছাপাখানাও খোলা হইয়াছে, এবং এখান হইতে 'মেসেজ' (Message) নামক একখানি ইংরাজি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া দেশবিদেশে পাঠান হইতেছে। এই 'মেসেজ' পত্রিকার দ্বারা সকল ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করাই কালীপ্রসন্ন বাবুর উদ্দেশ্য। যাহাতে ইহা প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজে এবং বহুতর ব্রাহ্ম-পরিবার মধ্যে স্থান পাইতে পারে তজ্জন্য ইহার বার্ষিক মূল্য সডাক এক টাকা মাত্র রাখা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই অল্পকাল মধ্যে দেশ-বিদেশে যশ ও খ্যাতি লাভ করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি ইহা ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্মসাধারণের যথোচিত সহানুভূতি লাভ করিতে পারিল না। ব্রাহ্মেতর সম্প্রদায় ইহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিলেও, যাঁহাদের জন্য ইহার আবির্ভাব তাঁহারা সদানন্দের এই নিঃস্বার্থ প্রচারকার্য্যে সহানুভূতি করিতে কুণ্ঠিত এবং পরাঙ্মুখ। ইহা লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবসা-হিসাবে পরিচালিত নহে। 'মেসেজ' কাহারও ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিতে আইসে নাই। ইহা সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলার্থ উৎসর্গীকৃত এবং সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের সম্পত্তি। সকল ব্রাহ্মসম্প্রদায়েরই মুখপত্র আছে সত্য, কিন্তু সেগুলি আপনাপন সম্প্রদায়ের জন্য পরিচালিত, আপনাপন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ আছে। কিন্তু মেসেজ সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক পত্র। ইহাতে সকল ব্রাহ্মসমাজেরই মতামত প্রকাশ করিয়া সকলের মধ্যে সৌহার্দ্দ ও মৈত্রী স্থাপনের বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের মতানুযায়ী গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব সকল আলোচনা করিয়া সাধারণের হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব বিশেষভাবে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা হইতেছে। ইহাতে যে আশাতীত শুভফল ফলিতেছে, তাহা পরে প্রকাশ করা যাইবে। আমাদের বিশ্বাস যে ব্রাহ্মসাধারণের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলে অতি অল্প দিন মধ্যেই ইহা ব্রাহ্মসমাজে এক নবযুগ আনয়ন করিতে পারিবে।

লর্ড আরউইনের ঘোষণাপত্র।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' একটা ধর্ম্মসমাজের মুখপত্র। কাজেই যে সকল বিষয়ের উপর ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব দৃষ্ট হয়, যথা নীতি, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি, সেই সকল বিষয়ই ইহাতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগও আলোচিত হয়, কারণ ইহাও পত্রিকা-প্রকাশের অন্যতর উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রনীতি যে পত্রিকার গণ্ডির বহির্ভূত, তাহা নহে। ধর্ম্ম অর্থে প্রকৃতপক্ষে যাহা মানবকে ও মানবসমাজকে ধারণপোষণ করে; যাহার ফলে মানবসমাজ উন্নতি ও মঙ্গলের পথে অগ্রসর হয়, তাহাই ধর্ম্ম। বলা বাহুল্য,

সুনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রনীতিও মানবসমাজকে উন্নতি ও মঙ্গলের পথে অগ্রসর করিতে পারে; সুতরাং রাষ্ট্রনীতিও পত্রিকায় আলোচনার অবিষয় নহে। তথাপি আমরা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহি যে, নানা কারণে স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক মতামত প্রকাশ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে, ধর্ম্মনীতির মূল তত্ত্ব ধরিয়া একথা আমরা বলিতে বাধ্য যে, সকল দেশের সকল জাতিরই রাষ্ট্রনীতির চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত—সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল। কিন্তু এই পথে চলিতে গেলে কি প্রকার উপায় অবলম্বন করা উচিত, কোন্ পন্থা ধরিতে হইবে, সোপানের পর সোপান ধরিয়া উঠিতে হইবে অথবা একেবারেই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের উপায় ধরা হইবে, ধীরপন্থী হইতে হইবে অথবা বীরপন্থী বা বিপ্লবপন্থী হইতে হইবে, এ সকল বিষয় আমরা রাষ্ট্রনীতিতে অভিজ্ঞদিগের হস্তে মীমংসা করিয়া স্থির করিবার ভার সন্ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। কেবল লর্ড আরউইনের ঘোষণাপত্র দেশের স্বাধীনতালাভের পথে একটা সুপ্রশস্ত সোপান বলিয়া ঘোষিত ও গৃহীত হইয়াছে। আমরাও যখন এই দেশের এক অংশ, তখন সে বিষয়ে কিছুই না বলিয়া সম্পূর্ণ নীরব থাকা সঙ্গত মনে করি না। এতদিন উহা লইয়া মহা বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছিল, আমরা সে বাদবিতণ্ডায় নামিতে ইচ্ছা না করিয়া চুপ করিয়া ছিলাম। এখন দ্বন্দ্ববিবাদের spirit অনেকটা থামিয়া গিয়াছে। এবং সম্প্রতি স্বনামধন্য ব্যারিষ্টারপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী statesman কাগজে এ বিষয়ে একটী সুন্দর নিরপেক্ষ পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন,—আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে ঘোষণাপত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত করাইতেছি।

To the Editor of the "Statesman."

Sir—I shall try to review briefly the constitutional significance of the Viceroy's recent pronouncement without any political passion or prejudice and purely from a constitutional point of view. The party controversy that has been raised in England and in less degree in this country for political purposes has to a great extent served to cloud the real issues in the minds of the lay public and it may serve some useful purpose to clarify the same.

The declaration of the Viceroy so far as it relates to the attainment of Dominion Status by India is in no sense a new declaration of policy. The Declaration of August 1917 and the preamble to the Government of India Act of 1919 admits of no other interpretation from the constitutional point of view. It is said that Sir Malcolm Hailey in his speech in the Legislative Assembly on the 8th of February 1924 in connection with Mr. Rangachariar's resolution for expediting the appointment of a Royal Commission for securing to India full self-governing Dominion Status gave a different interpretation to the Declaration of 1917. No donbt Sir Malcolm Hailey suggested that the term responsible government did not necessarily imply 'fnll Dominion status." But he at the same time referred to the Royal Warrant of Instructions which stated "thus will India be fitted to take her place among the other Dominions." He admitted also that "it may be that full Dominion Self-Government is the logical outcome of responsible government, nay, it may be the inevitavle and historical development of responsible government, but it is further and a final step." Thus it will be seen that he did not question that the implication of the Declaration of 1917 was Dominion Status for India. It has to be remembered that he was then Lord Reading's Home Member and must have said so with his concurrence.

The Royal Warrant of Instructions to the Governor-General assigns to India a place amongst the Dominions. Sir Malcolm Hailey refers to it and Lord Irwin says that his Instrument of Instructions expressly says so. In this connection I may point out that what is understood in constitutional law by Dominion Status is nowhere stated or provided for in the Statutes relating to the constitution of Canada, New Zealand or even Australia or south Africa but has to be gathered from the Instruments of Instructions that have been issued from time to time to the respective Governors-General.

It was proclaimed to the world at the

conclusion of the Treaty of Versailles in 1919 that Self-Government had been conferred on India and that she should be a signatory to the Treaty like the other Dominions and Lord Sinha signed it as her plenipotentiary.' It was on a similar representation that India was made an original member of the Assembly of the League of Nations. Since 1919 Indian representatives have been summoned to the Imperial Conference which purports to assign a place to India amongst the Dominions. Both Sir Malcolm Hailey and Lord Reading have overlooked these facts.

I think that by the declarations, proclamations and pronouncements Britain is pledged to assign Dominion Status to India. So Lord Parmoor is absolutely correct in saying that Lord Irwin with the concurrence of the present Government reaffirmed that pledge and Mr. Wedgewood Benn in maintaining that he has but reaffirmed Mr. Montagu's policy. Mr. Baldwin also states that the grant of responsible Government means equality with other States in the Empire. He says "nobody dreamt of Self-Governing India without Self-Governing States."

Sir Malcolm Hailey next proceeded to point out the difficulties that stood in the way of our attainment of the Dominion Status. These were, he said, principly (1) that India is not yet in a positime to organise her self-defence; (2) that India shall have to reconcile her communal differences; (3) that she will have to adjust the Dominion Status for India to the existing relationship between British India and the states under ndian rulers.

It is not my purpose to solve the problems. But it is admitted on all hands that these problems will have to be solved in laying the foundation and in the course of the consolidation of a Commonwealth for India. The Nehru Report is not merely a reply to the challenge of Lord Birkenhead but also to Lord Reading's policy as interpreted by Sir Malcolm Hailey.

The Congress suggested a Round Table Conference for framing a suitable constitution for India.

The Viceroy has now announced that the result of his mission to England has been that the Prime Minister, the Secretary of state and the British Cabinet with the concurrence of the President of the statutory Royal Commission have agreed, that after the reports of the Commission and the Central Committee have been published and considered, a conferance would be called "in which His Majesty's Government should meet representatives, both of British India and of the states, for the purpose of seeking the greatest possible measure of agreement for final proposal which it would later be the duty of His Majesty's Government to submit to Parliament." This is the more importaut part of the Viceroy's pronouncement. Not a word of dissent has been uttered regarding it by either the commission or any political party in England. Should the Conference be of a representative character and should it be able to arrive at a reasonably common measure of agreement the present Government is pledged to submit to Parliament and the Parliamenet will, surely, give statutory effect to such an agreed constitution as it did in the case of Canada and Australia.—Yours, etc.,

J. CHAUDHURI.

STATESMAN 13. 11. 29

Ballygunge, Nov. 9.

পত্রিকাপরিচয়।

অর্চ্চনা—অগ্রহায়ণ ১৩২৬—"তরু দত্তের যুগ" প্রবন্ধটী আমাদের বড়ই ভাল লাগিল। কুমারী তরু দত্তের সময়ের ভাব বেশ একটু ফুটাইয়াছে। "সংগ্রহ ও সংকলনে" আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা হইতে "স্বাস্থ্য-বিধি" উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। দেশীয় ভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার উপর যতই প্রচার হয় ততই দেশের মঙ্গল।

গৃহস্থমঙ্গল—কার্ত্তিক ১৩৩৬—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত কর্ত্তৃক লিখিত "মনুষ্যত্বের বিকাশে প্রকৃত শিক্ষা" উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। প্রকৃত শিক্ষাবিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। "টোটকা চিকিৎসা"র

অনেকগুলি পরীক্ষিত ভাল ঔষধের সংগ্রহ দেওয়া হইয়াছে। "নিউমোনিয়ার শুশ্রূষা শিক্ষা"র বক্তব্য বিষয় খুব সহজবোধ্য করিয়া লেখা হইয়াছে। নিউমোনিয়া রোগে বুকে পিটে পেঁয়াজের পুলটিস বড় উপকারী—ডবল নিউমোনিয়া সারিতে দেখিয়াছি। আমাকে ইহা একজন হাকিম বলিয়াছিলেন। "গরুর খাদ্য" প্রবন্ধে দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্য লিখিয়া গৃহস্থের বড়ই উপকার করিয়াছেন। আমরা পরীক্ষা করিব মনে করিতেছি। "চট্টগ্রাম বন্দরের শিল্পে" কয়েকটী শিল্প প্রচলিত আছে বলা হইয়াছে। কথা হইতেছে, এখনও আমাদের দেশের ধনীরা ব্যবসায়ে নামিতে চান না, মধ্যস্থিত্ত অথবা দরিদ্র লোকেরাই চান। কাজেই, দরিদ্রগণ বিনা পয়সায় কোন্ ব্যবসায়ে নামিতে পারেন এবং কি ভাবে নামিলে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাহাই একটু বিস্তৃত ভাবে লিখিলে দেশের উপকার হইতে পারে। "আবর্জ্জনার ব্যবহার" বড়ই সুন্দর লাগিল। লেখকের পরামর্শমত দেশের লোকেরা কি আবর্জ্জনার সদ্ব্যবহার করিতে উদ্যুক্ত হইবেন? "বেকার সমস্যায় চাষ" প্রবন্ধে চাষ আলস্যের কাজ নয়, ফাঁকির কাজ নয়, মূর্খের কাজ নয়, বলা হইয়াছে; ইহা সত্য কথা, খুব সত্য কথা। আমরা চাই যে একরাশ গল্পে ভরা কাগজের বদলে গৃহস্থমঙ্গলের মত কাগজ পল্লীবাসীমাত্রেরই হস্তগত হউক।

ব্যবসা ও বাণিজ্য—কার্ত্তিক ১৩৩৬—"রং ও বার্ণিশ প্রস্তুত প্রণালী" এবং "নারিকেলের কাতা প্রস্তুতের ব্যবসায়" প্রবন্ধ দুইটী ধারাবাহিক চলিতেছে; দুইটিই সহজ ভাবে সুবোধ্য ভাষায় লেখা হইতেছে। উদ্যোগী পুরুষ ইহা দেখিয়া ব্যবসায়ে নামিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। "বিবিধ প্রসঙ্গে" "সমাজে শুভলক্ষণ" পরিচ্ছেদে মেদিনীপুরের কোন লেডি ডাক্তার (বিধবা রমণী) সম্বন্ধে তাঁহার সাধারণ্যে মেলামেশা উপলক্ষ্য করিয়া সম্বাদপত্রে এক পত্র কে একজন প্রকাশ করিয়াছিলেন। কয়েকজন স্থানীয় ভদ্রলোক তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন দেখিয়া কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি বলিতে পারি না। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক ব্রণসন্ধানী মক্ষিকার ন্যায় লোকের দোষই খুঁজিয়া বেড়ায়; অনেক সময় দোষ না থাকিলেও দোষ create করে। Miss Mayoর নাম দিয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধী drain inspector; এই সকল দোষসন্ধানী তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন বলিয়া মনে হয় না। এই ব্যবসায় অতি ঘৃণিত কাপুরুষের ব্যবসায়। "স্বচ্ছ সাবান" সুলিখিত। বর্ত্তমানে যাঁহারা এই সকল ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা একটু সঙ্ঘবদ্ধ হইলে ভাল হয় মনে করি। "পল্লীপশুর ক্ষতরোগ" গৃহস্থের বড়ই কাজে আসিবে। "কয়লার খনির অবস্থা" আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। আমরা শুধু দীর্ঘ নিশ্বাসই ফেলিব—দুর্ব্বলস্য বলং রোদনং। "বিল্ব" প্রবন্ধে বেলের গুণাগুণ লিখিত হইয়াছে। বেল আগে ইংরাজদের মধ্যে চলিত ছিল না। Bengal Chemical হইতে বেলের সার প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে থাকিলে, শুনিয়াছি, বেল supplementary British Pharmacopeaতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এখন বিলাতী "বেলের জ্যাম" আমরা দোকানে চলিতে দেখিয়াছি। দেশের লোকেরা কি তাহাতে হাত দিতে পারেন না? আমাদের দেশের দোষ এই যে, প্রথম প্রথম আমরা সযত্নে জিনিস তৈরী করি, কিন্তু পরে আমরা সেরকম মনোযোগ দিই না, কাজেই standard নামিয়া যায়। বিলাতী জিনিসের standard একই থাকে, কারণ যন্ত্রে সমস্ত প্রস্তুত হয়। এই দিকে দেশীয় manufacturersদিগের দৃষ্টি থাকিলে ভাল হয়।

বর্ত্তমানে দেশের অনেক পত্রিকাই সুপরিচালিত হইতেছে। যতদূর সাধ্য সেই সকল পত্রিকায় ভাল বিষয় কি আছে, জানাইবার উদ্দেশ্যেই আমরা এই detailed সমালোচনা করি—আশাকরি ইহাতে পাঠকদের জানিবার সুবিধা হয় যে, কোন্ কাগজে কি ভাল বিষয় বাহির হইতেছে।

হোমিওপ্যাথিক পরিচারক—অক্টোবর ও নবেম্বর ১৯২৯—অন্ত্রাবরোধ সম্বন্ধে আমি হোমিওপ্যাথির সফলতা সম্বন্ধে দৃঢ় সাক্ষ্য দিতে পারি। আমার এক নিকট-আত্মীয়ার শিশু কন্যা পড়িয়া গিয়া আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং তাহার ফলে অন্ত্রাবরোধ উপস্থিত হয়। তাহার যন্ত্রণা কি ভীষণ, তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে উপলব্ধি হইতে পারে না। প্রথমেই আমরা ব্যস্ত হইয়া অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করাইলাম। ডাক্তারগণ বলিলেন, অবিলম্বে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হোক, নতুবা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রাণসংশয়। তখন আমরা আশা ছাড়িয়া দিয়া সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাক্তার অমরনাথ মুখার্জ্জি মহাশয়কে ডাকাইয়া চিকিৎসা করাইলাম। তাঁহার সুচিকিৎসার গুণে শিশু আরোগ্যলাভ করিল। এই রোগের চিকিৎসায় ঔষধ খাওয়াইবার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ঘি যথেষ্ট মালিশ করা হইয়াছিল, তাহারও বিশেষ ফল হইয়াছিল বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলাম। "বিসূচিকা" প্রবন্ধে লেখক ডাঃ শরচ্চন্দ্র ঘোষ একস্থানে লিখিতেছেন "ভোগ্য ও পানীয় দ্রব্যের সহিত রোগবীজাণু উদরস্থ হইলেই এই রোগ জন্মে"। আমরা তখন ছাত্র। তখন সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম বলিয়া

৺সুধীন্দ্র নাথ ঠাকুর

মনে হয় যে, বোম্বাই হাসপাতালের অন্যতর চিকিৎসক ডাঃ হাফকিন এই কথার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য এক কলেরা রোগীর মল ইচ্ছাপূর্ব্বক উদরস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ফলে তিনি ঐ রোগে পড়েন নাই। লেখক এবিষয়ে গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়া ভাল করিয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহার ফল প্রকাশ করিলে সুখী হই। এই প্রকার অনুসন্ধানই বিশেষজ্ঞ-দিগের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। এই রোগ নিবারণ করিতে গেলে পল্লীবাসীদের শিক্ষা আবশ্যক। কোন পল্লীতে কলেরা হইলে গৃহাদি পরিষ্কার করা প্রভৃতি উপায়ে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা দূরে থাক, কেবল ওলাবিবির পূজা দিবারই মহা ধুম পড়িয়া যায়। "আদর্শ প্রশ্নোত্তরমালা"র আকারে সাইলিসিয়ার প্রয়োগ ব্যক্ত করিলে পাঠকদের মাথায় ঠিক বসিয়া যায় কি না বলিতে পারি না। আমাদের মনে হয় Key to Therapeutics যেভাবে লেখা হয়, সেইভাবে এরূপ বিষয় লিখিত হইলে বেশী সহজবোধ্য হইতে পারে। "নবপ্রসূত শিশুর প্রাথমিক চিকিৎসা" সম্পূর্ণ হইলে পল্লীবাসীর বিশেষ উপকারে আসিবে। "সম্পাদকীয় বিচারশক্তির পরবর্ত্তী অধ্যায়" দেখিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইলাম। আমি দোষাদোষ বিচার করিতেছি না। প্রাণে বড় ব্যথা পাই যখন দেখি, আমাদের দেশবাসীরা বিবাদকলহে, এমন কি চিকিৎসার professional ক্ষেত্রেও এতটুকুও বিবাদকলহে প্রবৃত্ত হন। আমাদের মতে "সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে" মন্ত্র গ্রহণ করিলে সত্য নিজের শক্তিতেই প্রকাশ পাইবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব—১লা অগ্রহায়ণ ১৩৩৬—"মধুরস্বভাব কেশবচন্দ্র" প্রবন্ধে লেখক কেশবচন্দ্রের মধুর স্বভাবের অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। আমাদের বাড়ীতে আমরা বাল্যাবধি তাঁহার মধুর স্বভাবের অনেক কথা শুনিয়া আসিয়াছি।

সুধীন্দ্রনাথের পরলোকগমনে

(শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

(শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সৌম্য-মূর্ত্তি সুধীন্দ্রনাথ আর ইহজগতে নাই। যাঁর সঙ্গে শৈশব থেকে মনের মিল, যাকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতেম, তিনি সহসা আজ আমাদের ছেড়ে কেমন সহজে ইহলোকের ঝঞ্ঝা থেকে অবসর নিলেন। খুব অল্প বয়স থেকে ভাইদের মধ্যে তাঁর হৃদয় আমার অন্তরকে আকর্ষণ করেছিল। শৈশবে এক ক্লাসে আমরা উভয়ে পড়তেম—আমাদের প্রথম হাতেখড়ি হয় বিদ্যাসাগর ইস্কুলের এ, বি, সির ক্লাসে।

তার পরে ইস্কুলের দিক দিয়ে ধরিতে গেলে আমরা দুজনে দুই পৃথক লাইনে চলে গেলাম—তিনি রহিলেন Metropolitanকে ধ'রে, আর আমি সংস্কৃত কলেজে চলে এলাম। কিন্তু শৈশবের সেই প্রথম টান আমাদের জীবন থেকে কখনও বিলুপ্ত হয় নি।

বাল্যকালের একটা ঘটনা খুব মনে পড়ে। 'বাগান-খেলা' আমাদের একটা প্রধান সখের খেলা ছিল। বাড়ীর ভিতরের বাগানে এক একটা plot বা অংশ নিয়ে বাড়ীর যত ছেলেদের বাগান-খেলা হ'ত। সুধীদাদাতে ও আমাতে বাগানের একটা প্লট নিয়ে একসঙ্গে বাগান করেছিলেম। আমাদের সঙ্গে যোগে ছিলেন বিজয় কাকা। সে বাগানে আমরা নিজেরাই মালী, আবার নিজেরাই engineer বা রাজমিস্ত্রী যাই বল। বাগানে একটা ছোটখাটো দোতালা বাড়ীও করেছিলেম আমরা। সেই বাগানে যেদিন বাটী হয়, সেদিন আমাদের কি আনন্দ!

শৈশবের খেলাধূলা অপেক্ষাকৃত পরিপক্ক বয়সে গতি ফিরিয়ে দেয়; আমাদেরও তাই হয়েছিল। ষোল-সতের বৎসর বয়স থেকে আমাদের বাড়ীর ছেলেদের অধিকাংশেরই মাথা সাহিত্যচর্চ্চার দিকে ধাবিত হয়েছিল। সেই সময় থেকে মাসিক-পত্রে লেখা ও মাসিক-পত্র বাহির করা একটা জীবনের উচ্চ আশা ছিল। এই সময়ে সুধীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে ও উদ্যোগে যোড়াসাঁকোর বাড়ী থেকে 'সাধনা' নাম্নী পত্রিকাখানি বাহির হয়। যোড়াসাঁকোর চিরপালিতা 'ভারতী' তখন স্বর্ণপিসিমার হাতে পড়ে' অন্য জায়গা থেকে প্রকাশ হ'ত।

'সাধনা' পত্রিকা বাহির হবার প্রায় সমসাময়িক কাল থেকে আমাদের বাড়ীতে 'ভাই-বোন সমিতি', 'সুহৃদসমিতি' প্রভৃতি কয়েকটী সমিতি চলতে লেগেছিল। এই সব সমিতির প্রধানতঃ চালক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ।

এক-এক জন লোকের এক-এক রকমের বিশেষত্ব থাকে। সুধীন্দ্রের বিশেষত্ব ছিল জন-প্রিয়তায়। যে তাঁর সঙ্গে একবার মিলত, সে তাঁর বন্ধু না হ'য়ে যেত না। তাঁর আলাপের মিষ্টতায়, তাঁর নম্রতায় ও মিশুক ভাবটীতে সকলেই মুগ্ধ হ'য়ে যেতো। সে সময়ে এমন কোন বড়লোক ছিলেন না, যিনি সুধীবাবুর আলাপ-পরিচয়ে মুগ্ধ না হ'তেন।

এস্থলে সুধীন্দ্রের আরো কয়েকটী গুণের কথা না বলে' থাকতে পারিনে। ভগবানের প্রতি এরূপ একনিষ্ঠতা অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখা যায়। ভগবানের

Friday, the 27th Dec, 1929

9 A. M. Divine service.
9.30 A.M. Conference Meeting.
5 P. M. Addresses by the Chairman of the Reception Committee and the President.

Saturday, the 28th Dec. 1929

9 A. M. Divine service.
9.30 A.M. Conference Meeting.
5 P. M. Addresses by distinguished persons on the message of Thesm (Brahma Dharma).

Sunday, the 29th Dec, 1929

9 A. M. Divine service in English in the Brahma Mandir.
10 A. M. Conference Meeting.
5 P. M. Divine service in Hindi in the Brahma Mandir.

——

গার্হস্থ্যসংবাদ।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ১লা অগ্রহায়ণ রবিবার পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকার সময় ৺সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ তদীয় পুত্র শ্রীমান স্বরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক আদিব্রাহ্ম-সমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য বেদ স্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথভবনে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। ঋতেন্দ্রবাবু শ্রাদ্ধসভায় সুধীন্দ্রনাথের জীবনী সম্বন্ধে একটী সংক্ষিপ্ত রচনা পাঠ করেন। উহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। শ্রীইন্দিরা দেবী কয়েকটী সময়োচিত সঙ্গীত করেন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল, এবং সর্ব্বশেষে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল।

চতুর্থাহ শ্রাদ্ধ—গত ১০ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ন ৯ঘটিকায় ৺অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চতুর্থী-ক্রিয়া তদীয়া কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীকণিকা দেবী পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথভবনে যথারীতি সুসম্পন্ন করিয়াছেন; আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনাপূর্ব্বক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ২০শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ন ৯ঘটিকার সময় ৺অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ তদীয় পুত্র শ্রীমান অজীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-ভবনে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শয্যাসনাদি ষোড়শদ্রব্য দানানন্তর শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাসনা-পূর্ব্বক শ্রাদ্ধীয় উপদেশাদি প্রদান করেন। শ্রাদ্ধের আদি অন্তে ও মধ্যে শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে মহাশয় তাঁহার স্বভাবসুগম্ভীর কণ্ঠে তিনটী ব্রহ্মকীর্ত্তন করিয়া সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে আনন্দদান করিয়াছিলেন। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল এবং সর্ব্বশেষে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল।

শোক-সংবাদ।

৺অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর—স্বর্গীয় ৺দ্বিজেন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র অরুণেন্দ্রনাথ বিগত ১০ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার প্রাতে ৮॥ ঘটিকায় ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়া হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ায় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুসময়ে তাঁহার বয়স প্রায় ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ, দ্বিপেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ একে একে মহর্ষিপরিবার হইতে অন্তর্হিত হইলেন। সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই অরুণেন্দ্রনাথের এই আকস্মিক মৃত্যু। অরুণেন্দ্রনাথ নিরীহপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি একমাত্র পুত্র অজীন্দ্রনাথকে রাখিয়া গিয়াছেন। পরম পিতা তাঁহার উদারক্রোড়ে পরলোকগত আত্মাকে স্থান দান করুন ইহাই আমাদের কাতর প্রার্থনা।

স্বর্গীয় পণ্ডিত শঙ্করনাথ—গত ২৮শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা প্রায় ৬ ঘটিকার সময় স্বনামপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শঙ্করনাথ তাঁহার ভবানীপুরের ৬৫নং শম্ভুনাথ পাণ্ডিত-ষ্ট্রীটস্থ ভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যু-কালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। আবাল্যই ইনি একেশ্বরবাদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। যৌবনে ইনি স্বামী দয়ানন্দের ভাবধারার সহিত যুক্ত হইয়া বঙ্গ-দেশে আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমৃত্যু তাহারই সেবায় প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে পণ্ডিত শঙ্করনাথ বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ বিশেষভাবে অধ্যয়ন ও আলোচনাপূর্ব্বক তাহার ফলস্বরূপ ইংরাজী বাংলা ও হিন্দীভাষায় অনেকগুলি সুচিন্তিত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত শঙ্করনাথের ন্যায় এমন উদারহৃদয় সাহসী ও সরলভাষী লোক এযুগে বড় অল্প দেখা যায়। তাঁহার সহিত আমাদের বহুদিনের সৌহার্দ্দ। কোন শুভ কার্য্যে চিরদিনই তাঁহার অকপট সাহায্য ও সহায়তা লাভ করিয়া আসিয়াছি। আজ তাঁহার মত বন্ধুকে হারাইয়া সত্যই আমাদিগকে অনেকখানি অসহায় মনে করিতেছি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাঁহার অনেকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধে ভূষিত হইয়াছে। ভগবান তাঁহার পুণ্যময় উন্নত আত্মাকে আপন স্নেহাশ্রয় দান এবং শোকার্ত্ত সন্তান শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য পরিজনগণের অন্তরে শান্তিবারি বর্ষণ করুন।

একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৫ শক ২১শে ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দ্বাবিংশ কল্প—তৃতীয় ভাগ

সংখ্যা ১০৩৭ | ১৮৫১ শক পৌষ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে সম্পাদক— চলিতেছে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০০। সাল ১৩৩৬। শক ১৮৫১। খৃঃ ১৯৩০। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩০।

মাতৃ-মঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৬। আবার কবে?

জননী আমার! মনে পড়ে, ছেলে বেলায় ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীর ছোট ছোট ঢেউয়ের মত একটী একটী করিয়া কত আশা কত বাসনা প্রাণের উপকূলে আসিয়া লাগিত আর সরিয়া যাইত। আর মনে পড়ে, সেই সমস্ত আশা ও বাসনা তোমাকে না জানাইলে প্রাণ তৃপ্তি লাভ করিত না। তোমার কোলেতে মাথা রাখিয়া সেই সমস্ত আশা-বাসনা কত আবোল-তাবোল ভাষায় তোমাকে জানাইতাম। সে সমস্ত শুনিবার লোক তুমি ছাড়া দ্বিতীয় কেহ ছিল না। আমার প্রাণের সেই সমস্ত ছোট ছোট আশা-ভরসার কথা, ছোট ছোট দুঃখবেদনার কথা আধ আধ ভাষায় বলা শুনিতে তুমিও বড় ভাল বাসিতে। আমার প্রাণের সেই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশাভরসার কথা শুনিয়া, সফল হৌক বলিয়া আমার মাথায় হাত দিয়া কতই না আশীর্ব্বাদ করিতে। আবার, আমার দুঃখবেদনার কথা শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গে তোমার স্নেহ-হস্ত বুলাইয়া কি আশ্চর্য্য যাদুমন্ত্রে সেই সমস্ত ব্যথা নিমেষের মধ্যে নিঃশেষে দূর করিতে। তুমি আমার মুখের উপর তোমার কি যে করুণ স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে, আর আমিও তোমার মুখের দিকে কি যে আশ্চর্য্য নয়নে চাহিতাম, তাহা জানি না; জানিলেও বলিতে পারি না। আজ সংসারচক্রে নিষ্পিষ্ট হইয়া আমার প্রাণ ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে—কবে আবার বালকের মত, শিশুর মত তোমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িব, আর সর্ব্বাঙ্গে কাঁটার যে সমস্ত বিষম আঘাত লাগিয়াছে, তাহা দেখাইব—কবে আবার সর্ব্বাঙ্গে তোমার বেদনানাশন স্নেহ-হস্তের স্পর্শসুখ অনুভব করিব?

৭। নিবেদন।

জননী আমার! জীবনের সন্ধ্যাকালে তো আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এই সন্ধ্যাকালে আজ অনেক দিন যাবৎ তোমাকে প্রাণ ভরিয়া শতকণ্ঠে মা—মা বলিয়া বারবার ডাকিবার ইচ্ছা হইতেছে। এই আঁধার ঘরে আমার সঙ্গী কেহ নাই—সঙ্গী একমাত্র তুমি—তুমি আর আমি—সমস্ত কোলাহল স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে—প্রকৃতি সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। এই নিঝুম প্রকৃতির সুষুপ্তির স্পর্শে আমারও প্রাণের সমস্ত বাসনা, সকল আশানিরাশা, সমস্ত

সুখদুঃখের দ্বন্দ্ববিবাদ, বৃথা তরঙ্গকোলাহল থামিয়া গিয়াছে। তোমার চরণে আমি আমার মনপ্রাণ সমস্তই নিবেদন করিয়া দিলাম। তুমি যে আমার কি রকম মা, কাহাকেই বা তাহা বোঝাই? তুমি আমার মা—ইহা ব্যতীত আর তো কিছুই আমার বলিবার নাই—আর কিছুই আমি জানি না। একবার তোমায় প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিতে দাও। আমি জানি—আমি তোমার বড়ই দুষ্ট সন্তান; কিন্তু আমি তোমার সন্তান তো বটে। আমি খেলা করিতে করিতে তোমার বিনা আদেশেই তোমা হইতে কত না দূরে গিয়া পড়িয়াছিলাম। স্বীকার করি, আমার খুবই অপরাধ হইয়াছে; কিন্তু মা আমার! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—তুমি আমাকে এত দিন না দেখিয়া কেমন করিয়া স্থির ছিলে?

৮। ক্ষমাপ্রার্থী।

মা আমার! তোমার হারা ছেলে তাহার শত অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া তোমার চরণতলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কত দিন—কত দীর্ঘ দিন, তোমা হইতে সরিয়া গিয়া কত অপরাধই না করিয়াছি। শাস্তিও তাহার জন্য যথেষ্ট ভোগ করিয়াছি। একবার তুমি চাহিয়া দেখ—দেহের কোথাও আর বাকী নাই—সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দেহ ছিঁড়িয়া গিয়া রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে। মা! হারা সন্তানকে পাইয়া তোমার আনন্দ হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু হারা মাকে পাইয়া আমি তো আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়াছি। বারেকের জন্য, মুহূর্ত্তের জন্য একবার আমাকে কোলে তুলিয়া লও; তোমায় ছাড়িয়া আর আমি মুহূর্ত্তের জন্যও সরিয়া থাকিব না—আমার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। আর আমি কিছুই চাহি না—কেবল তোমার চরণ প্রাণের মধ্যে বুকের মাঝে ধরিয়া রাখিতে চাই। জননী! এবার যদি তোমা হইতে দৈবক্রমেও দূরে সরিয়া পড়ি, তবে কঠোর শাস্তি দিও; শাস্তি দিও, কিন্তু তোমার চরণতলে ফিরাইয়া আনিও। তোমার নিকট যে সমস্ত অপরাধ করিয়াছি, সে সমস্ত যখন স্মৃতিপথে জাগিয়া ওঠে, তখন আমাতে আর আমি থাকি না। তখন দুঃখশোক বিষাদনিরানন্দ উদ্বেলিত হইয়া মনপ্রাণের দুইকূল ছাপাইয়া উঠিয়া তোমার চরণে আছড়াইয়া পড়ে। যেমন অপরাধ করিয়াছি, তেমনি মা, প্রাণ ভরিয়া অশ্রুধারায় তোমার চরণ ধুইয়া ক্ষমাভিক্ষা করিয়াছি। আমার প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চাহিয়া আর বেশী শাস্তি দিও না। তোমার উপেক্ষাদৃষ্টি আমি সহ্য করিতে পারিব না। আমাকে কোলে তুলিয়া লও—উপেক্ষাদৃষ্টিতে আমাকে দগ্ধ করিও না।

আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী।

[গত ৩০ সেপ্টেম্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে বিবৃত]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

শিবনাথ বাবুর স্মৃতিসভা উপলক্ষে যখন নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম, তখনই আমি শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে সেই সভায় উপস্থিত হইব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম। সেই সভায় আমাকে যে কিছু বলিতে হইবে তাহা আমি ভাবি নাই, কারণ নিমন্ত্রণপত্রে দেখি যে শাস্ত্রী মহাশয়ের গুণকীর্ত্তনের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেরই নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে বক্তারূপে স্থির করা হইয়াছে। অবশেষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি—ডাঃ হেমচন্দ্র সরকার আমার গৃহে আসিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিসভায় কিছু বলিবার জন্য আমাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। আমি অবশ্য উপস্থিত বক্তা নই বলিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইলাম। কিন্তু তিনি নাছোড়বন্দা—আমাকে কিছুতেই অব্যাহতি দিলেন না। অগত্যা উপস্থিতমতে যাহা আমার প্রাণে আসে, তাহাই বলিতে আমি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম।

আমার স্বীকার করিবার অন্যতর বিশেষ কারণ এই যে, আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষকে বুঝাইতে চাই যে, আচার্য্য শিবনাথ শুধু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোক ছিলেন না। আমি অন্তত আদিব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছি যে, তিনি সমগ্র ব্রাহ্মসমাজেরই লোক ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংগঠনকালে, হইতে পারে যে, তাঁহার অন্তরে সাম্প্রদায়িক ভাব ছিল; কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁহার জীবনের শেষাশেষি তিনি সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। একবার ব্রাহ্মসমাজের দলাদলি লইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার কথালাপ হইতেছিল। আমিও তথায় উপস্থিত ছিলাম। সে সময়ে 'নব্যভারত'-পত্রে সাধারণসমাজের বিরুদ্ধে অনেক আন্দোলন আলোচনা চলিতেছিল। ঐ পত্রের সম্পাদক শ্রদ্ধা-

ভাজন দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী সাধারণসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটী পৃথক সঙ্ঘ স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাহাই উপলক্ষ্য করিয়া মহর্ষি শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিলেন—'তোমাদের মধ্যে তো দেখিতেছি, পঞ্চাশটা দল হইতে চলিল'; তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয় দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিলেন—'পঞ্চাশটা দল কেন, চৌষট্টিটা দল হইতে চলিয়াছে'। তখন আমি সবেমাত্র কলেজ হইতে বাহির হইয়া মহর্ষির অনুমতিক্রমে আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। সুতরাং আমি ঔৎসুক্য সহকারেই মহর্ষির সহিত শাস্ত্রী মহাশয়ের কথালাপ শুনিতেছিলাম। সেই কথালাপ শুনিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম যে, শাস্ত্রী মহাশয় নিজেকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা পছন্দ করিতেন না।

তিনি অক্লান্তকর্ম্মা ছিলেন। আমার সহিত যে অবধি তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় হইয়াছিল, সে অবধি তো তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে দেখিলাম না। তিনি ব্রাহ্মদিগকে সর্ব্বদাই বলিতেন—কাজ করিতে হইবে, কাজ করিতে হইবে। তাঁহার কর্ম্মশীলতার সর্ব্বপ্রথম পরিচয় পাই বাল্যকালে—আমার বয়স তখন ৬ বৎসর মাত্র। আমি তখন সংস্কৃত কলেজের নিম্ন শ্রেণীতে পড়ি। শিক্ষকগণ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত 'সমদর্শী' কাগজ নিয়মিতরূপে কিনিয়া আনিয়া আমাদিগকে শুনাইতেন যে তাহাতে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সকল প্রবন্ধ ধরিয়াই বলিতে গেলে শিবনাথ বাবুর সহিত প্রথম পরিচিত হই। ঐ সমদর্শী পত্রে তখন কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন দলের শিবনাথ বাবুর নেতৃত্বে সংগ্রামের বিষয়ে প্রবন্ধসকল অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রকাশিত হইতেছিল। সেই সকল প্রবন্ধ শুনিয়া শিবনাথ বাবু যে কিপ্রকার শক্ত সাংগ্রামিক (tough fighter) ছিলেন, তাহা অস্ফুটভাবে আমার অন্তরে প্রতিভাত হইয়াছিল।

তাঁহার কর্ম্মশীলতার জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। কেশবচন্দ্রের সহিত মতভেদের কারণে স্বমতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে কয়েকজন স্বাধীনচেতা বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক সমাজ সংস্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, আচার্য্য শিবনাথ তাঁহাদেরই অন্যতর অগ্রণী। শিবনাথ শাস্ত্রীর সাহায্য না পাইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যত শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তত শীঘ্র কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না। বোধ হয়, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আচার্য্য শিবনাথের অক্ষয় কীর্ত্তি। শাস্ত্রী মহাশয় সাধারণসমাজের প্রাণ ছিলেন। তিনি ইহাকে শুধু প্রতিষ্ঠিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু ইহাকে শক্তিমান করিবার জন্য তিনি প্রাণপাত করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া ব্রাহ্মসমাজ কিরূপে প্রকৃত লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতে পারে; ব্রাহ্মগণ কিরূপে নামেমাত্র ব্রাহ্ম না হইয়া প্রকৃত ব্রহ্মোপাসকের উপযুক্ত পরব্রহ্মে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনরূপ উপাসনার পথে আপনাদিগকে পরিচালিত করিতে অভ্যস্ত হইতে পারেন; কিরূপে ব্রাহ্মেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে পরস্পরকে সত্যধর্ম্ম সাধনে অগ্রসর হইবার পথে সাহায্য করিতে পারেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের পরিণত বয়সে ইহাই বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। আমি জানি, সাধনাশ্রম স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে তিনি এই বিষয়ের চিন্তায় সর্ব্বদাই কিরূপ নিমগ্ন থাকিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকটে এবিষয়ে তাঁহাকে কয়েকবার আশীর্ব্বাদ ও পরামর্শ গ্রহণ করিতে শুনিয়াছি। তাঁহার একনিষ্ঠ সাধনার ফলেই এই সাধনাশ্রমের জন্ম। উৎসবের সময় এই সাধনাশ্রমকে আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ দেখিয়া আমি অনেকবার কত-না আনন্দ লাভ করিয়াছি।

শাস্ত্রী মহাশয়ের যে শিক্ষা দীক্ষা ছিল, তাহাতে ইচ্ছা করিলে তিনি স্বচ্ছন্দে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পাইতে পারিতেন। সেকালে তাঁহা অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিও সহজেই ঐ পদ লাভ করিতেন। সেকালে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইলেই গবর্ণমেণ্টের চাকরী পাইবার প্রচুর সম্ভাবনা হইত। আচার্য্য শিবনাথ তো এম-এ শ্রেণীতে সংস্কৃতে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরী পাওয়া কত সহজ ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তিনি সেরূপ কোন চাকরীর প্রার্থী হন নাই। তিনি ভগবানের আহ্বান অন্তরে শুনিয়াছিলেন, এবং সেই আহ্বানেরই উত্তরে সাড়া দিয়া ভগবানেরই অধীনে কর্ম্ম করিতে আত্মনিয়োগ করিলেন।

কেবল কতকগুলি বড় বড় কার্য্যেই যে তাঁহার মহাপুরুষত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা নহে। বড় বড় কাজে বড় বড় চেষ্টা আমা অনেকেরই পক্ষে স্বাভাবিক। দেশের যখন বড় বিপদ; দেশের ঘাড়ে চাপিয়া বিদেশীরা যখন দলে দলে আসিয়া রক্তশোষণের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করে, তখন নেপোলিয়নের মত লোকের আত্মশক্তি প্রকাশ করিয়া মহাপুরুষের আসন গ্রহণ করা কিছু আশ্চর্য্য নহে। রুষিয়ার মত দেশে সম্রাট যখন পদে পদে প্রজাদের স্বাধীনতা নির্মূল করিবার চেষ্টা করেন; পদে পদে লোকের স্বাধীন চিন্তার নিশ্বাস রোধ করিয়া তাহাকে উৎপাটিত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পান, তখন

তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাঁহার মন্ত্রগুরুকে হত্যা করিয়া বা সেই চেষ্টায় নিজের জীবনকে বিসর্জ্জন দিয়া লোকদৃষ্টিতে মহাপুরুষরূপে দাঁড়ানো বড় বেশী কঠিন নহে। কিন্তু প্রকৃত মহাপুরুষত্ব প্রকাশ পায় মানুষের ছোটখাটো কাজে—যেখানে লোকের দৃষ্টি পড়ে না; যেখানে লোকের হাততালি পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। মহাপুরুষের মহাপুরুষত্ব প্রকাশ পায় আত্মার সেই বীরত্বে—যে বীরত্বের বলে তিনি ভুলভ্রান্তি স্বীকার করিতেও পরাঙ্মুখ হন না। রাজা রামমোহন রায় তাঁহার শতবিধ কার্য্যের জন্য মহাপুরুষের আসন গ্রহণের অধিকারী হইতে পারেন এবং হইয়াছিলেন। কিন্তু আমার অন্তরে তাঁহার জন্য মহাপুরুষের আসন তখনই বিছাইয়া দিই, যখন দেখি যে, তাঁহার প্রতিপক্ষ যখন অপবাদ দিলেন যে, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিলেও তদুপযোগী কার্য্য করেন না, তখন তিনি নিন্দা বা প্রশংসার প্রতি দৃকপাত না করিয়া, স্বাভাবিক বিনয়-গুণে সে দোষ স্বীকার করিয়া আপনাকে "সম্যগনুষ্ঠানাক্ষমত্বজন্য-মনস্তাপবিশিষ্ট" বলিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। সেইরূপ শাস্ত্রী মহাশয়েরও অনেক ছোট ছোট কাজে তাঁহার উদার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিলাম। পার্কষ্ট্রীটে মহর্ষির অবস্থানকালে শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে যে গাঢ় আলিঙ্গন দিয়াছিলেন, তাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না। ইহা জানা কথা যে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পদানুসরণে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং তৎপরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদের উপাসনাপ্রণালী হইতে বৈদিক বা অন্যান্য শাস্ত্রের সংস্কৃত মন্ত্রের ব্যবহার নির্ব্বাসিত করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। শাস্ত্রী মহাশয় ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণের ফলে বুঝিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত মন্ত্র সম্পূর্ণ বর্জ্জন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে অন্যতর গুরুতর পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার পরলোক গমনের পূর্ব্বে কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হইত। দেখা হইলেই ঘুরিয়া ফিরিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়েই নানা কথালাপ হইত; এবং কথা পড়িলেই তিনি প্রায়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেন—'ক্ষিতীন্দ্রবাবু, আমরা সংস্কৃত ছাড়িয়া দিয়া কি যে ভুল করিয়াছি, এখন তাহা বুঝিতেছি'। আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট সাধারণব্রাহ্মসমাজের নেতা আচার্য্য শিবনাথের নির্ভীকভাবে ভুল স্বীকারেই আমি তাঁহার মহাপ্রাণতা উপলব্ধি করিতাম।

ধর্ম্ম—প্রকৃত সত্যধর্ম্মকে তিনি অন্তরে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়াই আচার্য্য শিবনাথ হৃদয়ের এই নির্ভীকতার পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে কৌস্তুভমণির মত অন্তরে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মন্ত্র পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যোগসাধনে তাঁহার অচল আস্থা ছিল। তিনি এই যোগসাধনমূলক উপাসনায় তরুণ ব্রাহ্মদিগের অনাস্থায় দুঃখপ্রকাশ করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পরিবারে তিনি এই বিধান বাঁধিয়া দিয়াছেন যে, প্রাতে উপাসনা না করিয়া কেহই জলস্পর্শ করিবে না।

প্রতিদিন নিয়মিত উপাসনা করিবার সার্থকতা বিষয়ে একদিন তিনি কথায়-কথায় মহর্ষিকে একটী সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন। 'অনেকে বলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রার্থনা প্রভৃতির যথাযুক্ত সাড়া পান না এবং সেই কারণে উপাসনার প্রকৃত কোন মূল্য আছে বলিয়া ভাবিতে পারেন না। কিন্তু সেটা ভুল। সকল সময়েই যে আমরা ভগবানকে ডাকার মত ডাকিতে পারি তাহা নহে, সুতরাং সকল সময়েই যে ভগবানের নিকট হইতে আমাদের প্রার্থনার সাড়া পাওয়া যাইবে, এমন আশা করাও যায় না। প্রার্থনা করিতে-করিতে পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগসাধনমূলক উপাসনায় অভ্যস্ত হইলে যথাসময়ে আত্মাতে যে সাড়া পাওয়া যাইবে; তাহার প্রেমের যে বন্যায় আত্মার উষরভূমি ভাসিয়া যাইবে সেই এক সাড়াতেই, সেই এক বন্যাতেই সমস্ত জীবন উর্ব্বর হইয়া উঠিবে, শস্যশ্যামল হইয়া উঠিবে, ধন্য হইবে।' ইহারই অনুকূল শাস্ত্রী মহাশয় একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দিলেন। 'পশ্চিমাঞ্চলে অনেক নদীপথ আছে; সেগুলি গ্রীষ্মকালে জলশূন্য অবস্থায় কেবল বালুচররূপে দেখা যায়। সেগুলি গ্রীষ্মকালে জলে পূর্ণ থাকে না বলিয়া তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্রস্বামী কৃষকেরা যদি সেগুলিকে সমান করিয়া নিজ নিজ ক্ষেত্রের সহিত একসমান করিয়া লয়, তবে তাহার ফল হইবে ঐ কৃষকদেরই সর্ব্বনাশ—যথাসময়ে বর্ষাকালে যখন পর্ব্বত হইতে খরবেগে জলস্রোত নামিয়া আসিবে, তখন সে স্রোত বাহির হইবার উপযুক্ত পথ না পাইয়া সমস্ত ক্ষেত্রের উপর দিয়া বাহিয়া যাইবে এবং তাহার পরিণামে ক্ষেত্রগুলি বালিতে ভরিয়া গিয়া অনুর্ব্বর হইয়া পড়িবে; কিন্তু সেই স্রোত বাহির হইবার পথ অব্যাহত থাকিলে যথাসময়ে তাহা জলে ভরিয়া উঠিত, এবং সেই জল লইয়া কৃষকেরা নিজ নিজ ক্ষেত্রের উন্নতিসাধনে সক্ষম হইত।' মহর্ষি শাস্ত্রীমহাশয়ের এই কথা ও দৃষ্টান্ত শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

এই স্থলে পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার প্রত্যক্ষ যোগমূলক উপাসনার সফলতা বিষয়ে একটা গল্প না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। পূজ্যপাদ জ্যেঠামহাশয় সত্যেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের বিলাত যাত্রার পূর্ব্ব রাত্রে পূজ্যপাদ পিতামহদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গৃহে উপাসনা করেন। সেই উপাসনায় তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, "শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য যেমন নিয়মিত অন্ন আহার করা আবশ্যক, সেইরূপ উপাসনাকে আত্মার অন্ন জানিয়া প্রতিদিন নিয়মিতরূপে পরমাত্মাতে আত্মসমাধান করিতে কখনই বিরত হইবে না।' আমি সত্যেন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়াছি যে, সেই উপদেশ তিনি অন্তরে ধারণ করিয়া একটী দিনও উপাসনা করিতে বিরত হন নাই; তাহার ফলে তিনি বিলাতের শতবিধ প্রলোভনের হস্ত হইতে নিজের চরিত্রকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমরা জানি, মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে যখন অজ্ঞান হওয়ায় নিতান্তই অক্ষম হইয়া পড়িলেন তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি প্রতিদিন নিয়মিত উপাসনা করিয়া আসিয়াছিলেন।

আজকাল তরুণসমাজের অনেকেই, ব্রাহ্ম বা অব্রাহ্ম, উপাসনার সার্থকতা স্বীকার করা তো দূরের কথা, জীবনের কোনও বিভাগেই ধর্ম্মের সম্পর্ক রাখার ঔচিত্যই স্বীকার করিতে চান না। তাঁহারা স্বীকার করুন বা নাই করুন, আসলে তাঁহাদের অন্তঃকরণ বিলাতী ভাবে নিতান্তই ডুবিয়া গিয়াছে; তাই তাঁহারা দাসভাবে অনুভাবিত হইয়া বিলাতী ফ্যাষনের বশবর্ত্তী হইয়া ঢাকঢোল-পিটুনিওয়ালা বিলাতী সম্প্রদায়বিশেষের শতচর্ব্বিত উক্তির উদ্গার করিয়া প্রকাশ করিতে চান যে, তাঁহারা এক নবতর মহাসত্য আবিষ্কার করিয়াছেন এবং দেশের মঙ্গলের জন্য তাহা প্রচার করিতে যত্নবান হইয়াছেন। ইহা তাঁহাদের মহা ভুল। জীবনের সহিত ধর্ম্মের সম্পর্ক রাখা উচিত নয়; এই তত্ত্ব সম্প্রতি রুষিয়া তুরস্ক প্রভৃতি কয়েকটী দেশে পরীক্ষাধীন আছে—তাহার ফলাফল ও পরিণাম এখনও জানা গিয়াছে বলা যায় না। এই অবস্থায় আমরা ঐ অজ্ঞাতপরিণাম তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিতে পারি না। বরঞ্চ বিষ্ণুশর্ম্মার কথিত ও বহুলপরীক্ষিত সত্য হিতোপদেশ অনুসারে এইপ্রকার আশ্রয় গ্রহণ করা ভয়াবহ বলিয়াই মনে করি।

আর, ঐসকল দেশের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযান-বিষয়ক ক্রিয়াকলাপ আমরা যতটুক সম্বাদপত্রে পড়িয়াছি, তাহাতে এইটুকু বুঝিয়াছি যে, ঐ অভিযান প্রকৃত সত্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে নহে, কিন্তু প্রচলিত সাম্প্রদায়িক উপধর্ম্মসমূহেরই বিরুদ্ধে। যে ধর্ম্ম দেশে গুরুবাদ, পুরোহিতপ্রাধান্য স্থাপিত করিয়া দেশকে অন্তঃসারশূন্য করিতে বসে; যে ধর্ম্ম দেশের অন্তরে স্বভাবত পচ আনয়নের বিষয়ে এবং তাহার অপরিহার্য্য পরিণাম পরাধীনতার পঙ্কিল স্রোত দেশের সর্ব্বত্র আনয়নের বিষয়ে সহায়তা করে; এবং যে ধর্ম্মের পরিণামে জাতি শতবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত না হইয়া যাইতে পারে না, ঐ সকল দেশ সেই সমস্ত সাম্প্রদায়িক উপধর্ম্মেরই বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা জানা কথা যে, রুষিয়াতে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম হইতে প্রসূত অতিরিক্ত গুরুবাদই তাহার সম্রাট-পরিবারকে পরাধীনতার চাপে চাপিয়া নিহত করিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। ধর্ম্মের নামে তুরস্কের সুলতানের অস্বাভাবিক প্রধান্যের ফলে দেশে যে দুর্নীতিমূলক অনাচারের স্রোত চলিয়াছিল এবং পরাধীনতা সমগ্র দেশকে যে গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছিল, তাহারই প্রতিবাদকল্পে বর্ত্তমান তুরস্কপতি ঐ ধর্ম্মের মধ্য হইতে উপধর্ম্মের আগাছা বিনাশসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

প্রকৃত সত্যধর্ম্ম মানবের অন্তরের বস্তু। বাহিরের শত চাপেও তাহাকে নিষ্পিষ্ট করিয়া নির্ম্মূল করিবার ক্ষমতা কাহারও আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। হয়তো কিছুকালের জন্য তাহা অপ্রকাশিত থাকিতে পারে; কিন্তু দুইদিন, দশদিন, দুই বৎসর দশ বৎসর বাদে তাহা শত কঠিন বাঁধন ভেদ করিয়াও ফুটিয়া উঠিবে। এই সত্যধর্ম্মের পরিণামে পরাধীনতা আসিতে পারে না, ইহার মূল প্রাণই হইল স্বাধীনতা। ইহার মূল মন্ত্র হইল—মূল বিষয়ে ঐক্য, অবান্তর বিষয়ে পার্থক্যের সম্ভাবনা এবং সকল বিষয়ে উদার দৃষ্টি—Unity in essentials, differece in nonessentials and charity in all।

আমরা যদি সেই মহাপুরুষ আচার্য্য শিবনাথের দৃষ্টান্তে আমাদের জীবনকে উন্নতির পথে শ্রেয়ের পথে পরিচালিত করি, তবেই তাঁহার স্মৃতিসভা সার্থক হইবে। তাঁহার পথে চলিতে গেলে আমাদেরও বীরের ন্যায় সত্যধর্ম্মকে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া অন্তরে ধরিয়া রাখিতে হইবে, এবং উপাসনাকে প্রাণের ভিতর একনিষ্ঠ হৃদয়ে বরণ করিতে হইবে।

সকলেই গেছে এগিয়ে।

ভয়রোঁ।

(শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সকলেই চলে গেছে
কতদূরে এগিয়ে—
যেতে হবে সারা পথ,
ভগ্ন মোর মনোরথ
পড়ে আছে না গিয়ে;

রিপুদল আসি চোর
বাঁধি মোরে, মায়া-ডোর
ধরে' আছে বাগিয়ে।
বন্ধন মোচন কর
হে প্রভু করুণাকর!
ভিক্ষা আজি মাগি এ—
দয়ার সাগর যদি
কেন কষ্ট নিরবধি
বল গো কি লাগিয়ে?
যাতনায় পড়ে' থাকি—
প্রভু বলে' সদা ডাকি
সারা-রাতি জাগিয়ে;
ক্ষমা কর সব দোষ
নিতি তব নাম যশ
গাহিবে অভাগী এ।

পারশিক শিল্প

(ডাঃ শ্রীপ্রসন্নকুমার আচার্য্য আই ই এস, এম-এ, পি এইচ ডি, ডি-লিট)

সংখ্যায় নগণ্য হইলেও পার্শীরা ধন-সম্পদ, বিদ্যা-বুদ্ধি, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ভারতবহির্ভূত শিখ, রাজপুত, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অনেক জাতি এক্ষণে সর্ব্ববিষয়ে ভারতীয় হইয়াছে। কিন্তু পার্শীরা এখনো নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। পারস্যে পার্শীদের সংখ্যা দশ হাজারের বেশী নহে। ভারতে তাহারা প্রথমে সজন নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। তারপর ক্রমশঃ সুরাট, নবসারী ব্রোচ ও কাম্বেতে বাস করিতে আরম্ভ করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহারা বেশীরভাগ বোম্বাইতে স্থায়ী হইয়া পড়ে। আপাততঃ তাহাদের সংখ্যা প্রায় এক লাখ। তাহাদের ধর্ম্ম নানা নামে পরিচিত। অনুশাসন হিসাবে ইহা দ্বৈত; সৃষ্টিকর্ত্তার নাম অনুসারে ইহাকে মজ্‌দা বলে; পুরোহিতদের সাধারণ নামে ইহা মগী; প্রবর্ত্তকের নামে ইহা জোরষ্ট্রী; এবং প্রত্যক্ষ উপাস্য দেবতার নামে ইহা অগ্নির উপাসনা। ইহাদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থের নাম জিন্দ আবেস্তা। বস্তুতঃ আদিম নাম আবেস্তাই। জিন্দের অর্থ টীকা বা ভাষ্য, আর আবেস্তার অর্থ অনুশাসন বা আইন। এই গ্রন্থ দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে বেন্দিদাদ, বিস্‌পেরাদ ও যস্ন নামক তিন অংশ। বেন্দিদাদে ধার্ম্মিক অনুশাসন ও পৌরাণিক গল্প আছে। সকলে একত্র হইয়া বার বার মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যাজ্ঞ বা অগ্নির উপাসনার বিধি বিস্পেরাদে দেখিতে পাওয়া যায়। যস্ন নামক অংশেও এরূপ বিধি আছে; কিন্তু এই অংশের বিশেষত্ব ইহার গাথা নামক পঞ্চ মন্ত্রে। এই অংশের সহিত সামগানের সামঞ্জস্যে আছে। দ্বিতীয় ভাগের নাম খোর্দ্দা বা ক্ষুদ্র আবেস্তা। ইহাতে ছোট ছোট উপাসনার মন্ত্র আছে, যাহা কেবল পুরোহিতেরাই নহে, সকল পার্শীরাই দিন, মাস বা বৎসরের কোন বিশেষ তিথিতে অগ্নি প্রভৃতি ভৌমিক দেবতার সম্মুখে আবৃত্তি করে। এই সকল উপাসনাও নানা অংশে ও নামে পরিচিত, যথা পঞ্চগা, ত্রিংশ সিরোদা, ত্রি-আফ্রিগাণ ও ষড়ন্যায়ী।

প্রাচীন ঐতিহাসিক হেরোডটাসের মতে (১,১২১) পার্শীদের দেবমূর্ত্তি, মন্দির বা উপাসনার বেদী প্রভৃতি কিছুই ছিল না। ইহার কারণ তাহারা ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বে আদৌ বিশ্বাস করে না। সেজন্য মন্দিরাদি নির্ম্মাণ তাহারা মূর্খতার কার্য্য বলিয়া মনে করে। শৈলশিখরে জিউস্ বা দ্যৌস্ নামে অসীম আকাশের উপাসনা করাই তাহাদের বিধি। একটা প্রবাদ আছে যে পারশিক সম্রাট জরাক্সস্ আথেন্স নগরীর মন্দিরসমূহ জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। রিপবলিক (৩, ৯, ১৪) ও লেগিবস (২, ১০, ২৬) নামক গ্রন্থে সিসেরো ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে ভগবানকে মন্দিরের ভিতর সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবার মূর্খতার জন্য শাস্তি দেওয়ার অভিপ্রায়েই জরাক্সস্ গ্রীসীয় মন্দিরসমূহ ধ্বংস করিয়াছিলেন। হেরোডটাস্ কিন্তু অন্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে সম্রাট দরিয়াস্ গৌমাতা কর্ত্তৃক বিনষ্ট "মন্দির"সমূহ পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যে অর্থে এইস্থলে 'মন্দির' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা কাহারো মতে 'অয়দন' বা সংস্কৃত 'আয়তন' শব্দের ঠিক অনুবাদ নহে, কেননা 'অয়দন' শব্দের মৌলিক অর্থ 'পবিত্র' বা 'উপাসনা'র স্থান মাত্র।

মন্দিরের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না তাহা সত্য। কিন্তু অগ্নির উপাসনার জন্য শৈলশিখরে বেদীর অনুরূপ স্থান ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। কেননা উপাসনা-ভাবাপন্ন সম্রাট দারিয়াসের মূর্ত্তি শৈল-সমাধিগাত্রে ছিল। অন্য এক সম্রাটের এরূপ একটি মূর্ত্তি অলিকসুন্দরের পরবর্ত্তী যুগের এক মুদ্রাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। ডিউলকয় সুসা নামক রাজধানীর সমতল ভূমিতে ধ্বংসাবশিষ্ট গৃহের বর্ণনায় যাহা বলিয়াছেন তাহাতে হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈনদের মন্দিরের অনুরূপ কিছুই বুঝায় না। তাহা আতেশ-গা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই আতেশ-গা শৈলশিখরস্থ তিনটী

শৃঙ্গ-বিশিষ্ট বেদীর সমষ্টি। ইহার সহিত অরোহণের জন্য স্তম্ভযুক্ত সোপানশ্রেণী নির্ম্মিত হইত। পার্শিপলির নানা হর্ম্ম্যের প্রাচীরস্থ ছবিতে ও পারস্যের সর্ব্বত্র এরূপ আতেশ-গার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইত।

মন্দিরের অবর্ত্তমানে দেবদেবীর মূর্ত্তি পারস্যে থাকিতেই পারে না। বস্তুতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে য়োকাম্ অনিহিতের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া বেরোসস্ যে সাক্ষ্য দিয়াছেন পারস্যে তাহার কোন চিহ্নই বর্ত্তমান নাই। বেন্দিদাদ সদাতে মূর্ত্তির যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই অনিহিতের মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের একমাত্র প্রমাণ হইতে পারে। রাজপ্রাসাদের অলঙ্করণ রূপেও কোন দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্লুটারক্ রচিত অলিকসুন্দরের জীবনীতে (অঃ ৩৭) দেখিতে পাওয়া যায় যে অলিকসুন্দর যখন বিজয়ীরূপে পারস্যের প্রাচীন রাজধানীতে প্রবেশ করেন তাঁহার সৈন্যেরা সম্রাট জরাক্সসারের মূর্ত্তি পদচ্যুত করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক পেরট প্রভৃতির মতে জরাক্সসের মূর্ত্তির কোনই সম্ভাবনা ছিল না। পক্ষান্তরে আসেরিয়া ও পার্শীপলী প্রভৃতির ন্যায় এই স্থলেও জরাক্সসের ছবিই ছিল, মূর্ত্তি নয়। পাসর গদিতে বিধ্বংস প্রাপ্ত সাইরসের মূর্ত্তিই পারস্যের আদিম মূর্ত্তির একমাত্র চিহ্ন। সম্রাটদের ন্যায় সৈনিক, পরিচারক ও সিংহ প্রভৃতির ছবিতেও দেখিতে পাওয়া যায় পারশিক শিল্পীদের নৈপুণ্য মোটেই ছিল না। যুদ্ধ প্রভৃতি চিত্রেও ছবির আড়ষ্ট ভাব সর্ব্বত্র চিত্রকরের ত্রুটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাচীনকালে মন্দিরশিল্প ও স্মৃতিসৌধের পরেই শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপযোগী প্রাচীর প্রাকার প্রভৃতির দ্বারা আবদ্ধ গ্রাম, নগর ও দুর্গ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা শিল্পীর প্রধান কাজ ছিল। কিন্তু আলিকসুন্দর যখন পারস্য আক্রমণ করেন তখন সে দেশে কোনরূপ প্রাচীরাবদ্ধ নগর নগরী ছিল না। একবতানা বা সুসা প্রভৃতির চারিদিকেও প্রাচীর দেখা যায় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় প্রাচীন কালেও পারস্যের নগর-নগরী সুশৃঙ্খলভাবে রাখা হইত। স্থূল প্রাচীরাবদ্ধ দুর্গের ভিতরে সম্রাটেরা নিরাপদে নিজেরাও থাকিতে পারিতেন আর ধনরত্নও রক্ষা করিতে পারিতেন। ব্যাবিলোন ও আসিরিয়ার অনুকরণে নির্ম্মিত সুসা নামক নগরীর বর্ণনা হইতে পারশিক দুর্গের সম্যক নমুনা পাওয়া যাইতে পারে। ইহার বর্ণনায় ডিউলফয় বলিয়াছেন যে ইহার চারিদিকে প্রথমতঃ জলপূর্ণ গভীর ও বিস্তৃত পরিখা ছিল। সৌর ও দ্বিরাবর্ত্ত প্রাচীরের সহিত ইহার সংযোগ ছিল। প্রথম বা বাহিরের প্রাচীর তেইশ মিটর প্রশস্ত ও বাইশ মিটর উচ্চ এবং কর্কশ ইষ্টকনির্ম্মিত ছিল। ভিতরের প্রাচীর প্রায় পনেরো মিটর প্রশস্ত ও চারি মিটর গভীর এবং কাঁচা ইটের দ্বারা নির্ম্মিত। এই দুই প্রাচীরের মধ্যেই প্রধান প্রধান হর্ম্ম্যসমূহ নির্ম্মিত হইত।

বাস্তুশিল্পের মধ্যে কোন কোন রাজহর্ম্ম্যের আংশিক বৃত্তান্ত মাত্র পাওয়া যায়। সাধারণ বাসগৃহের কোনরূপ ধ্বংসাবশেষ বা বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। পারশিক রাজপ্রাসাদ ঐতিহাসিকেরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন, যথা,—খোলা সভাগৃহ, প্রাচীরাবদ্ধ দরবার গৃহ, ও খাসমহল বা বাসোপযোগী প্রাসাদ। একবাতানা সুসা ও পার্শিপলিস প্রভৃতি রাজধানীতেই যে কেবল রাজ-প্রাসাদ ছিল তাহা নয়। শীত-গ্রীষ্মের আতিশয্য নিবারণের জন্য সম্রাটগণ যেখানে যেখানে বৎসরের কয়েকমাস বাস করিতেন সে সকল স্থলেও রাজহর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করা হইত। পালিক্লিটাসের বর্ণনা অনুসারে (ষ্ট্রাবো. ১৫, ৩, ২১) সুসার শৈলশিখরে প্রত্যেক পারশিক সম্রাটই নিজেদের ব্যবহারের জন্য স্বতন্ত্র প্রাসাদ, ধনাগার ও সভাগৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া-ছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা এই কথার যাথার্থ্য সন্দেহ করেন। পার্শিপলীর ন্যায় সুসাতেও মনোরম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদ ছিল তাহা সত্য। কিন্তু সুসাতেও সে সকল হর্ম্ম্যের কোনরূপ চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। ইংরাজ ও ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই পর্য্যন্ত সুসার ভূস্তর হইতে ধ্বংসাবশেষের টুকরা ব্যতীত আর কিছুই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

ষ্ট্র্যাবো (১৫, ৩; ৩, ৭, ৮) ও য়্যারিয়নের (৩; ১৫; ৩; ১০) বর্ণনা অনুসারে সম্রাট সাইরাস্ অস্তি-অগকে পরাজিত করিয়া পাসারগদী নামক রাজধানীতে অনেক প্রাসাদ ও ধনাগার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যাহা গ্রীসীয়দের পারস্য আক্রমণের সময়েও বর্ত্তমান ছিল। এই সকল সৌধের ধ্বংসাবশেষ মিয়েদ-ই-মুরঘাব্ নামক গ্রামে প্রোথিত আছে এরূপ অনুমান করা হয়। আন্দাজ করিয়া তাহাদের যে সকল নক্সা করা হইয়াছে, সে সকল হইতে তাহাদের আকৃতির কতকটা আভাস পাওয়া যায়। প্রথমতঃ চারিটি স্তম্ভযুক্ত মুখভদ্র বা পৈঠা। ইহার দুই দিকে প্রকোষ্ঠ। তৎপরে এক প্রকাণ্ড শালা বা সভাগৃহ। ইহাকে দুই সারি স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা চারিখণ্ডে ভাগ করা হইয়াছে। এই সকল স্তম্ভের দ্বারাই ছাদ রক্ষিত। কিন্তু স্তম্ভগুলি পার্শিপলী বা সুসার স্তম্ভের ন্যায় বড় নহে। ইহাদের প্রাচীরও জামবিদের তক্তের বেদীর প্রাচীরের ন্যায় গভীর নহে। এই রাজধানীস্থ

'ক্ষুদ্র প্রাসাদ' ও সোলোমনের তক্তের এমন কিছুই নাই, যাহা হইতে সে সকল হর্ম্ম্যের কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

পার্শিপলী নামক সুবিখ্যাত রাজধানীর যে যে জায়গায় সম্রাটগণ রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সেই সকল স্থানে আপাততঃ গণ্ডগ্রাম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। বেনামী হর্ম্ম্যগুলির ধ্বংসাবশেষ শোচনীয় অবস্থাপন্ন। রাজ-স্বাক্ষরযুক্ত চারি সম্রাটের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা নেহাৎ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। এই চারি প্রকার হর্ম্ম্যের মধ্যে কোন দুইটাই একরূপ নহে। তারপর রাজসভা এবং বাসোপযোগী গৃহ ও প্রকোষ্ঠ প্রভৃতির পদবিন্যাস বা নক্সা ও পরিমাপের সাদৃশ্য বা মিল দেখিতে পাওয়া যায় না।

পার্শিপলীর উদ্ধারপ্রাপ্ত হর্ম্ম্যরাজির মধ্যে একটি বেদী নামে পরিচিত। ইহাতে সম্রাট দারিয়াসের স্বাক্ষর ও শিলালিপি আছে। ইহার সীমা এক প্রদক্ষিণরথ্যা বা গাড়ীর রাস্তা দ্বারা প্রদর্শিত। এই রাস্তা দক্ষিণ মুখের সমতলভূমি হইতে ক্রমশঃ বেদীর উপর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। তারপর এই রাস্তা হর্ম্ম্যের পশ্চাৎ ভাগ দিয়া পাহাড়ের প্রথম ধাপ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। অবশেষে পূর্ব্বমুখো হইয়া শিখরস্থ সমতলে গিয়া শেষ হইয়াছে, যেখানে দুইটী সমাধিক্ষেত্র। এই শিখরস্থ সমতলভূমি এক বিখ্যাত সোপানশ্রেণীর সহিত সংযুক্ত। কিন্তু এই শ্রেণীতে একশত এগারটির বেশী সিঁড়ি নাই।

এই বেদী উপর-নীচ হিসাবে চারি সমতল স্তরে বিভক্ত—সর্ব্ব নিম্নস্তর অপরিসর ও নগণ্য। ইহাতে কোনরূপ হর্ম্ম্য কখনও নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয় স্তর সমগ্র বেদীর তিন-চতুর্থাংশ স্থান ব্যাপিয়া নির্ম্মিত। ইহার উপরেই প্রোপিলি ও শতস্তম্ভ সভাগৃহ প্রভৃতি প্রধান হর্ম্ম্যরাজী নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রায় তিন মিটর উপরিস্থিত তৃতীয় স্তরেই জরক্সসের চিত্তাকর্ষক প্রাসাদ ও হিপস্টাইল নামক সভাগৃহ এবং দরিয়াসের সুবিখ্যাত প্রাসাদ ছিল। অবশেষে চতুর্থ স্তরের অগ্নিকোণে কোনরূপ এক হর্ম্ম্য ছিল যাহা এক্ষণে আর চিনিতে পারা যায় না।

প্রোপিলী ও হিপস্টাইল নামক সভাগৃহে সম্রাট জরাক্সসের স্বাক্ষর আছে। প্রোপিলীর প্রায় কিছুই বর্ত্তমান নাই। হিপস্টাইল সভাগৃহেরও অধিষ্ঠান ও তদুপরিস্থ স্তম্ভসমূহের মধ্যে তিনটির মাত্র মধ্যভাগ বা বপু দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া যে নক্সা করিয়াছেন তাহা হইতে ইহার পূর্ব্ব অবস্থার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। বাহাত্তর স্তম্ভের দ্বারা পরিবেষ্টিত সভাগৃহই ইহার প্রধান সৌন্দর্য্য ও বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহার মেজেতে ছত্রিশটি স্তম্ভের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা একটি চতুরস্র প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠ যাহার প্রত্যেক পার্শ্বের দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে তেতাল্লিশ মিটর। ইহার সংলগ্ন আর একটি হর্ম্ম্যের গর্ভের মাত্র দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। পারস্যের প্রাচীন হর্ম্ম্যাবলীর মধ্যে এই হিপস্টাইলকে সম্রাজ্ঞী বলা হয় অনেক কারণ বশতঃ। প্রথমতঃ ইহার সোপানশ্রেণী বিস্ময়কর ও বিচিত্র অলঙ্করণে ভূষিত। দ্বিতীয়তঃ ইহার অসাধারণ উচ্চতা। তৃতীয়তঃ ইহার চিত্তাকর্ষক চারি সারি স্তম্ভশ্রেণী। অবশেষে ইহার সুবিস্তীর্ণতা। ইহার অন্তরস্থ জমি উনবিংশ ফেরোয়া নামক মিশরের রাজবংশের সুবিখ্যাত পরিষদ্ গৃহের জমি অপেক্ষা বেশী। সাকল্যে ইহার জমির মাপ প্রায় সাড়ে সাত হাজার বর্গ মিটর।

শত স্তম্ভযুক্ত সুবিখ্যাত সভাগৃহে কোন সম্রাটের স্বাক্ষর নাই। ইহা হিপস্টাইলের পরিবর্দ্ধিত আকার। ইহা এক সমান্তরাল ক্ষেত্র। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ইহার প্রশস্ততা প্রায় ছিয়াত্তর মিটর, এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে দৈর্ঘ্য প্রায় বিরনব্বই মিটর। এক এক সারিতে আটটি, এরূপ দুই সারি স্তম্ভ ইহার প্রত্যেক পার্শ্বেই ছিল। উত্তরদিকে মুখ। ইহার সহিত আরও অনেক প্রকোষ্ঠের সংযোগ ছিল। সমস্ত জমি এক-এক সারিতে দশটি, এরূপ দশশ্রেণী স্তম্ভ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই সুরম্য হর্ম্ম্যের প্রায় কিছুই বর্ত্তমান নাই।

পারশিক বাস্তু-শিল্পের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত রাজপ্রাসাদ সকলও একতলই ছিল, দ্বিতল ত্রিতল প্রভৃতির কোনরূপ সম্ভাবনাই প্রাচীন পারস্যে ছিল না। ফারগুসনের ভুল ধারণা পেয়ট (পারশিক শিল্প ৩২০, ৩৪১) প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিকেরা হাস্যাস্পদ মনে করেন। পারস্যের আধুনিক প্রাসাদ ও বাসগৃহসমূহও এক তলাই।

পারস্যের শিল্পসম্পদ কখনও গ্রীস, রোম, মিশর, চীনদেশ বা ভারতবর্ষের শিল্পের সহিত আদৌ তুলনার বিষয় ছিল না। বস্তুতঃ কয়েকটি রাজপ্রাসাদ ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কিছুই প্রাচীন পারস্যে নির্ম্মিতই হয় নাই।

কুসংস্কারের প্রভাব।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

দেশ-বিদেশে কুসংস্কারের যে কি প্রকারে উৎপত্তি হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে, অনেক সময়ে তাহার কোনই খোঁজ পাওয়া যায় না—কালের গর্ভে তাহার মূল কারণ বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু মানবসমাজের উপর এখনও কুসংস্কারের যথেষ্ট প্রভাব যে দেখা যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সন্ধান করিলে এখনও অনেকগুলি কুসংস্কারের মূল কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে পুরীতে জগন্নাথদেবের রথের তলে লোকে আত্মহত্যা করিত। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ইহার মূলে অতিরিক্ত অসংগত ভক্তি। পূর্ব্বে স্পেনদেশে, বাড়ীঘরের আবর্জ্জনা বাড়ীর সম্মুখস্থ সদর রাস্তার ধারে পুরুষ-পরম্পরায় স্তূপাকারে রাখার রীতি ছিল। কেহ কেহ তখন ভয়ে তাহা স্পর্শ করিত না। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, ঐ আবর্জ্জনার স্তূপের উপর গৃহের অপদেবতা বসিয়া থাকেন। তাহাদের ভয় ছিল যে, ঐ আসন বিচলিত করিলে অপদেবতার কোপানলে গৃহস্থের ভয়ঙ্কর অকল্যাণ ঘটিবে। বলা বাহুল্য, ইহার মূলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ঐ আবর্জ্জনাস্তূপকে নাড়াচাড়া দিলে তাহার গন্ধ ও বিষ যে গৃহে ছড়াইয়া পড়িয়া অকল্যাণ আনয়ন করিত, ইহা নিশ্চয়ই তাহাদের নিকট পরীক্ষিত সত্য ছিল।

আমাদের দেশে সন্তানলাভের উদ্দেশ্যে গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন কুসংস্কারের ভীষণ দৃষ্টান্ত। ইহার মূল কোথায় জানি না। যদি কোন তথাকথিত শাস্ত্রের এই অসংগত বিধান হয়, তাহা বলিতে পারি না। আমাদের কিন্তু এটাকে স্বার্থসিদ্ধির কল্পনামূলক নিছক কুসংস্কার বলিয়া মনে হয়।

আফ্রিকার অনেক দেশে বর্ব্বর জাতিদের মধ্যে সংস্কার আছে যে, বিশেষ লক্ষণযুক্ত নরমাংস অথবা তিথিবিশেষে নরমাংস ভোজন করিলে পরম সুখে চির স্বর্গবাস হয়। এই কুসংস্কারের কারণে ইউরোপীয়গণের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও নরমাংস ভক্ষণের রীতি ঐ সকল জাতির মধ্য হইতে নির্ম্মূল হইয়া উঠিয়া যাইতেছে না। এই রীতির পরিণামে অনেকস্থলে পিতা স্বীয় সন্তানেরও মাংস খাইতে কুণ্ঠা বোধ করে না। এই কুসংস্কারের মূল স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে বিষম শত্রুতা। তিথিবিশেষে নরমাংস ভক্ষণের মূলে বোধ হয় কোন সুদূর অতীতে সেই দিনে কোন যুদ্ধে জয়লাভ হইয়া থাকিবে।

আমাদের দেশে কুসংস্কারের প্রভাবের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। বৃহস্পতির বারবেলায় যাওয়া। কি কুক্ষণেই খনার নাম দিয়া এই প্রবচনটী প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল—"যদি পাও রাজ্য দেশ, তবু না যাও বৃহস্পতির শেষ"। এই প্রবাদে তো দেখছি, "দেশ" শব্দের সঙ্গে "শেষ" শব্দের বেশ মিল খাইয়াছে। জানি না, সেই মিলের কারণে অথবা অন্য কোন কারণে কথাটী সমস্ত হিন্দু জাতির মধ্যে কি না জানি না, কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুদের প্রাণের খুব গভীর স্তরে শিকড় নামাইয়া বসিয়া আছে। প্রকৃতই অনেক স্থলে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, এই কুসংস্কারে প্রকৃত বিশ্বাসী অনেকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বৃহস্পতির বারবেলায় বাটীর বাহিরে যাইতে স্বীকার করেন নাই। বিশ্বাসীদিগের মনোভাব দেখাইবার জন্য একটী গল্প বলি। একদিন বৃহস্পতিবার না জানিয়া আমার দুইটী আত্মীয় এই কলিকাতা সহরে বাজার করিতে বাহির হইলেন। তখন শরৎকাল—ভাদ্রমাস। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের ফিরিবার মুখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল এবং বড় রকমের একপসলা বৃষ্টি নামিল। তাঁহারা যখন তাঁহাদের বাড়ী হইতে দুই মিনিটের পথ দূরে, তখন রাস্তায় একহাঁটু জল। কাজেই সেইটুকু পথ আসিতেও তাঁহারা ঠিকা গাড়ীর আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। বাড়ী ফিরিয়া তাঁহারা এমন গুরুতর (!) বিপদের কারণ সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহারা বৃহস্পতিবার বারবেলাতেই বাহির হওয়ায় এই বিপদে পড়িয়াছিলেন। এই যে দেশীয়-বিদেশীয় শত সহস্র লক্ষ লোক প্রয়োজন বশত বৃহস্পতিবার বারবেলায় চলাফেরা করিতেছে—কয়জন তাহাদের মধ্যে খানাখন্দে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে? বাঙ্গালী হিন্দুরা শুধু বৃহস্পতিবার বারবেলায় অন্য কোথাও যাওয়া দূরে থাক, সারা বৃহস্পতিবার কোন শুভকর্ম্মেই সহজে নামিতে চায় না!

এই প্রকার শনির শেষ, দিক্‌শূল, ত্র্যহস্পর্শ, হাঁচি টিকটিকি, জাতিবিশেষের মুখদর্শনে যাত্রায় বাধা ইত্যাদি কতবিধ কুসংস্কার যে এদেশে চলিত আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমার এক বন্ধু আমার সম্মুখেই তাঁহার এক উচ্চতম কর্ম্মচারীকে কি এক কার্য্যের উদ্দেশ্যে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তদুত্তরে তিনি তাঁহার মনিবকে জানাইলেন যে, এখন শনির শেষ, সুতরাং এখন গেলে তিনি যে কোন কর্ম্ম করিতে বলিবেন, তাহা নিষ্ফল হইবে, সুতরাং তিনি (কর্ম্মচারী) আগামী কল্য সকালেই যাইবেন! এ প্রকার কুসংস্কারের অধীনতা স্বীকার করিবার ফলে আমরা যে কিরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছি ও যাইতেছি, ইহা তাহারই অন্যতর প্রমাণ। তরুণ যুবক—উৎসাহে উদ্যমে

পরিপূর্ণ; কিন্তু যখনই এই প্রকার কুসংস্কারের সম্মুখীন হইতে বাধ্য হন, তখনই, বিষহর প্রস্তরের নিকট সর্প যেমন নিস্তেজ ভাবে মাথা অবনত করে, সেই যুবকও যেন কেমন একরকম নিস্তেজ হইয়া পড়ে। যুবকেরই বা দোষ দিই কি প্রকারে? বাড়ীতে বাপ-মা হইতে আরম্ভ করিয়া দাসদাসী পর্য্যন্ত সকলেই যে সর্ব্বদাই ঐ সকল কুসংস্কার মাথায় বসাইয়া দিবার জন্য হাতুড়ি লইয়া বসিয়া আছে! এই সকল কুসংস্কারের বোঝা মাথায় লইয়া আমরা স্বাধীনতাসংগ্রামে অগ্রসর হইব কি প্রকারে, তাহাই ভাবিয়া মরি।

আমার একজন বন্ধু সম্মুখে যোগিনী থাকিতে যাত্রা যে কিছুতেই করা উচিত নহে, তাহা তাঁহার জীবনে অনেক প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। আমি সম্মুখে তর্ক করিয়া তাঁহার ঐ কথার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলাম; তাঁহার পশ্চাতে, বলিতে কি, অনেক দিন পর্য্যন্ত আমি যোগিনীভীত হইয়া উঠিলাম—কোথাও যাইতে হইবে, প্রথমেই দেখিতাম, যোগিনী কোন্ দিকে। একদিন মনের দৃঢ়তা আনিয়া পঞ্জিকা দেখা ছাড়িয়া দিলাম—প্রাণের উপরে যে কুসংস্কারের বট শিকড় নামাইতেছিল, তাহার শিকড় নামান বন্ধ হইয়া গেল, আমিও বাঁচিলাম।

এই কুসংস্কারের বিভীষিকা অনেকটা ভূতের ভয়ের অনুরূপ। আমরা বাল্যকালে নর্ম্যাল স্কুলে পড়িতে যাইতাম। সেখানে সহপাঠীরা, এমন কি শিক্ষকেরাও ভূতের ভয় দেখাইতেন। সেইখানেই প্রথম শিক্ষা করি যে, ভূতের পা উল্টাদিকে এবং দেবদারু গাছে তাহার বাসা। রামনাম জপিতে থাকিলে তবে ভূত পলায়ন করে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বাড়ীর একধারে একটা দেবদারু গাছ ছিল। সন্ধ্যার পর সেখানে যাইতে গেলে প্রাণ হাতে করিয়া রামনাম জপিতে জপিতেই যাইতাম। সম্ভবত তাহারই ফলে আজ পর্য্যন্ত ভূত আমার ঘাড় ভাঙ্গিতে সাহস করে নাই। আমার পিতৃদেব নিজেও অস্থিবিদ্যা (anatomy) অধ্যয়ন করিতেন এবং আমাদিগকেও বাল্যাবধিই তাহা পড়াইতেন। তাহার জন্য একটা স্ত্রীলোকের কঙ্কাল আমাদের পাঠগৃহে টাঙ্গানো ছিল। এক পার্শ্বে একটা ভাঙ্গা piano ছিল। আমাদের পাঠান্তে সেই ঘরে একজন চাকর শয়ন করিত। সে ভূতের ভয়ে আপাদমস্তক ঢাকিয়া শুইত—যেন মুড়ি দিয়া শুইলে ভূত আর তার ঘাড় ভাঙ্গিতে সাহস করিবে না! সে মাঝে মাঝে প্রায়ই আমাদিগকে বলিত যে, ভূত আসিয়া রাত্রে piano বাজায়। আমরাও ভয়ে সে ঘরে সন্ধ্যার পর সহজে যাইতাম না। অবশেষে কি কারণে সে ঘরে বাধ্য হইয়া গিয়াছিলাম—দেখি, pianoর ভিতর দিয়া এক ইন্দুর বাহির হইয়া আসিল এবং বাহির হইবার কালে pianoর যে যে পরদার উপর দিয়া চলিয়া গেল, সেই সেই পরদা বাজিয়া উঠিল। ভূতের piano বাজাইবার রহস্য ভেদ হইল এবং আমারও ভূতের ভয় বিদূরিত হইল। সেকালে মিটমিটে প্রদীপ এবং সার্সির ময়লা কাচে সেই প্রদীপের আলোর প্রতিফলন, সর্ব্বোপরি সঙ্গী ও চাকরদাসীর নিকটে শ্রুত ভূতের গল্প এই বিভীষিকা আনয়নে বিশেষ সহায়তা করিত। কিন্তু এখন ইলেক্‌ট্রিক আলো সহজে জ্বালাইবার সুবিধা এই বিভীষিকা দূর করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

মঘা-অশ্লেষায় যাত্রানিষেধের কথা কোন্ হিন্দু না জানে? এক সাহেবের মঘা মাথায় করিয়া বাহির হইবার ফলে প্রাণসংশয়ের গল্প বহুল প্রচলিত আছে। একবার আমার কন্যাকে বিদেশ হইতে সত্বর আনা আবশ্যক হইল। আমি দেখিলাম যে, সেদিন অশ্লেষা। অশ্লেষায় যাত্রার ফলাফল পরীক্ষা করিবার জন্য এ বিষয়ে কাহাকেও একটী কথাও না বলিয়া আমার কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দিলাম। আমার মনও যে সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ ছিল তাহাও বলিতে পারি না। অবশেষে যখন কর্ম্মচারী কন্যাকে নির্ব্বিঘ্নে আনিয়া উপস্থিত করিল, তখন তাহাকে মহা আস্ফালনের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম—"কাল অশ্লেষায় তুমি যাত্রা করিয়াও তো আজ নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া পড়িয়াছ?" তখন সে উত্তর দিল—"মঘা কি অশ্লেষা না জানিয়া গেলে কোনই বিঘ্ন হয় না"! এই দুই নক্ষত্রে যাত্রা পঞ্জিকার লেখা ব্যতীত কেন যে নিষিদ্ধ, তাহার কোন কারণ আবিষ্কৃত হয় নাই।

১৩ সংখ্যা এখনও ইউরোপে অশুভসূচক বলিয়া ধরা হয়। ইহারও মূল অজ্ঞাত। যাই হৌক, এই কুসংস্কারের প্রতাপ ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য আমেরিকায় একটী সভা হইয়াছে বলিয়া সম্বাদপত্রে পড়িয়াছিলাম স্মরণ হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশে অনেকের বিশ্বাস আছে যে, এক টেবিলে ১৩ জন আহার করিলে তাহাদের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই সেই বৎসরের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু পরলোকগত লর্ড রবার্টস্ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারিতে ১২ জন বন্ধুর সঙ্গে ভোজন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই সে বৎসর মৃত্যুমুখে তো পড়েনই নাই; প্রত্যুত তাঁহারা সকলেই পাঁচ বৎসর বাদে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহে যুদ্ধও করিয়াছিলেন। সে বৎসরও তাঁহাদের মধ্যে কেহই মরেন নাই; প্রত্যুত তাহার ছয় বৎসর বাদে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ঐ ১৩ জনই এক টেবিলে ভোজন করিয়াছিলেন।

বিলাতে আর একটী কুসংস্কার বড়ই প্রবল। লবণ

তুলিতে গিয়া যদি দৈবাৎ চামচ হইতে ছড়াইয়া পড়ে, তবে ভোজনটেবিলে সমাগত ব্যক্তিগণ বড়ই অমঙ্গলের আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠেন। বিলাতী ধরণের আহারাদি টেবিলের উপর চাদর পাতিয়া হয়, ইহা সকলেই জানেন। সেই চাদরের উপর লবণ বিক্ষিপ্ত হইলে চাদরখানি নষ্ট হইতে পারে, ইহা ব্যতীত এই কুসংস্কারের আর কোন মূল কারণ তো খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশেও লবণ সম্বন্ধে একটা কুসংস্কার আছে। একজনের পাতে যে লবণ দেওয়া হয়, তাহা হইতে যদি সে তাহার একটুখানি গ্রহণ করে, তবে সে লবণ হইতে তাহার পুত্রকন্যা কেহই আর কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না, গ্রহণ করিলে প্রথম গ্রহীতার আয়ুক্ষয় হইবে। এই কুসংস্কারের মূল কি জানি না।

এদেশে বেলগাছ ও তুলসী গাছ, উভয়ই পবিত্র—একটী শিবের সহিত সংপৃক্ত, অপরটী বিষ্ণুর সহিত সংপৃক্ত। বেলগাছের পাতা শিবের মস্তকে চড়ানো হয়, এবং তুলসীপত্র বিষ্ণুর পূজায় নিবেদিত হয়। কিন্তু বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্যের বাসা থাকে বলিয়া ভয় দেখানো হয়, তুলসীগাছে তেমন কোনই বিভীষিকার কারণ আছে শোনা যায় না। আমার তো মনে হয় বেলগাছের কাঁটাই এই কুসংস্কারে মূল। রাত্রে বেলগাছের নিকটে কোন সূত্রে গেলে তাহার কাঁটায় দেহখানি ক্ষত-বিক্ষত হইলে যে ব্রহ্মদৈত্যের নখরাঘাতের তীব্র আস্বাদ পাওয়া যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু তুলসীতলায় গেলে সেরূপ আঘাত পাইবার কোনই আশঙ্কা নাই—তুলসীগাছ অহিংসা মন্ত্রের প্রতিনিধি।

আমাদের দেশে ধোপার নাম করিলে নাকি ভোজনে বিশেষ ব্যাঘাত পড়ে। একস্থানে খাইতে বসিয়াছি—সেখানে কথায় কথায় দৈবাৎ ধোপার নাম করিলাম। গৃহকর্ত্তা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন—"ঐ যাঃ, আপনি যখন ধোপার নাম করিলেন, তখন ভোজনে ব্যাঘাত ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা"। বলা বাহুল্য যে ভোজনে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে নাই। যতদূর জানি, আজ অনেক বৎসর হইয়া গেল, তথাপি তাঁহার সে কুসংস্কার আজ পর্য্যন্ত তাঁহার মন হইতে দূর হয় নাই। ধোপারা নোংরা কাপড় কাচে, ইহাই এই কুসংস্কারের মূল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা হইলে "ধোপা"র বদলে "রজক" বা "কাপড়-কাচা" ইত্যাদি প্রতিশব্দ ব্যবহার করিলে নাকি কোনই দোষ আসে না—এ ভাব আসিল কিপ্রকারে? এই প্রশ্নের সমাধান তত্ত্বসন্ধায়ীদিগের গবেষণার জন্য রাখিয়া দিলাম।

দেশ-বিদেশে যতপ্রকার কুসংস্কার আছে, একত্র সংগ্রহ করিলে মন্দ হয় না। আমাদের দেশের লোকেরা কুসংস্কার, ভয় প্রভৃতির এত ভারী বোঝা মাথায় বহন করিয়া চলিতেছে যে, তাহাদের পক্ষে উন্নতির পথে, স্বাধীনতার পথে, মঙ্গলের পথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের অধিবাসীরাও যে এই প্রকার বোঝা বহন করে না তাহা নহে—কিন্তু তাহা এদেশের মত এত ভারী নয় বলিয়া তাহারা ছুটিতে সক্ষম হইতেছে। আসল কথা এই যে, কুসংস্কার তোমাকে যতই অধিকার করিবে; বৃথা বিভীষিকায় তুমি যতই আঁতকাইয়া উঠিবে, ততই তুমি স্বভাবতই সকল মঙ্গলের নিদান, স্বাধীনতার উৎস ভগবান হইতে দূরে সরিয়া যাইবে। সমস্ত কুসংস্কার বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ পূর্ব্বক দেখ এবং কুসংস্কারকে কুসংস্কার জানিয়া নির্ভীক হৃদয়ে পরিত্যাগ কর এবং নির্ভয় হও।

THE

Message of Buddhist India,

(2)

(DHARMA ADITYA DHARMACHARYYA).

The end of this first universal teacher's life meant a fresh impetus to the noble mission which He had entrusted to His disciples. The three, four or five Buddhist Councils held at Rajagriha, Vaisali and other places, gave a difinite shape to His teachings which crystallised into the Tri-pitakas or the Three Baskets. The Pitakas were later on translated into ninety-six languages in ninety-six countries, thus showing the greatest extension of the doctrine. Lately these have been translated into many more languages both in Asia and Europe.

Buddhism was the predominant religion in India in the time of emperors Asoka, Kanishka, till the reign of the last emperor Harshavardhana or Siladitya II in whose time Hiouen Tsang the prince of Chinese pilgrims came to India in the seventh century A. D. After this Buddhism remained prevalent in various provinces. Recent researches show that Buddhism existed in Bengal upto the sixteenth century A. D. It is the advent of western iconoclasts who dealt destruction to the glories of Aryan culture in many parts of India, and the North-West. But the recent ar-

chaeological researches and explorations have brought to light the wide prevalance of Buddhism in India, Afghanistan, and Turkestan. Asoka's stone pillars and stupas extending from Nepal to Mysore prove the wide imperial policy of the Buddhist emperor to spread Dharma or spiritual culture.

The Buddhist universities of Nalanda, Vikramasila, Odantapuri and other places testify to the promotion of Buddhist and allied culture in India. The system of education developed in these institutions may be traced in an almost identical manner in the universities or monastic institutions of Sera, Dhebung, Gaden and Tashilumpo in Tibet even now.

Buddhist culture included all arts and crafts that gave an impetus to the promotion of Buddhism in all its aspects and ramifications and crystallized into what may now be called Buddhist civilization. Medical science, surgery, arts and crafts, and all useful subjects formed the carriculum of Buddhist studies. Chemistry formed an essential part of the Buddhist Tantras which came into prominence in Mahayana Buddhist countries after their introduction particularly from the Buddhist universities of Vikramasila and Odantapuri in Bengal.

Buddhist monks have played a prominent part in the cultural conquest of the world. Since Buddha inaugurated the unique system of sending His disciples to preach in as many directions, Buddhism was introduced into different regions of Asia by Buddhist monks who, selfsacrificing and highly inspired as they were, went to China, Mongolia, Manchuria, Koria, Siam Annam, Tibet, Nepal, Java, Japan, and the Malay Archipelago. The latest discovery has led to the fact that one thousad years before the discovery of America by Columbus, a Buddhist priest from Kabul had gone to China whence he went to Mexico, set up Buddhist temples and started a mission. The recent problem ahead is to identify Buddhism with Maya civilization about which researches are still in a state of progress.

The departure of Santaraksita, the first Buddhist Missionary and of Dipankara from Bengal to Tibet, of Bodhidharma to China from South India, of Mahendra and Sanghamittra to Ceylon, of the Indian monks to Burma, Nepal and other countries give a glorious vision of the part that Buddhist India played in expanding the all enlightening, all-fraternizing culture of Lord Buddha.

So on this momentous occasion connected with the Advent, Buddha-hood, and Decease of Lord Buddha, the message of Buddhist India has some element of truth behind it. The Buddha Day celebration is not a new innovation in the modern history of Buddhism in India. From the records of Hiouen Tsang we learn that upto the seventh century A. D. the Buddha Day was celebrated by princes and people of India and thousands of people used to gather at all the sacred places connected with His life and Teachings. Although the Buddha Day appears to have stopped for some centuries owing to economic chaos and the persecutions that Buddhism underwent, it was observed in all Buddhist countries outside India. The Nepalese, where the descendants of the Sakyas are still predominant in number, called it Vaisakha Swan-ya or Flower Festival, Burma called the month Kason, the Sinhalese called the month Wesak, the Japanese called it Hana Matsuri or Flower Festival, the Tibetans called the Vaisakh month Sakya-dawa. Similarly Buddha Day is observed in all other Buddhist countries according to their national chronology. It is not strange to hear that the Hindus have been holding the Full Moon Day in Kashmere even now. Various societies and organisations have begun to hold it. It appears that about 1891 Rai Sarat Chandra Das Bahadur and the Anagarika Dharmapala introduced this festival in Calcutta itself. Since then various Buddhist societies have been regularly holding the celebration. On behalf of the Nepalese Buddhists resident at Calcutta, who have recently inaugaurated the Buddhist India society, we have decided to hold it on a small scale.

The Message of Buddhist India to the people of India is one of exhortation to

them to understand the oneness of life, superior efficacy of spiritual brotherhood, importance of intercommunal goodwill and unity, strenous self sacrifice in the cause of peace and freedom of India.

Her message to the Buddhist institutions and individuals in India is peace and goodwill and the exhortation for mutual co-operation and understanding the principle of unity as the basis of national strength. This has been lately possible through the all-India Buddhist conference which I have been able to organize.

To the Buddhist countries her message is keen sympathy in their strenuous struggle for spiritual revival and the promotion of spiritual culture. The time is fast nearing for the fruition of the goodwill in the shape of an All-World Buddhist Congress to be held not later than 1932.

To the Buddhists in the west, Buddhist India sends her cordial message of goodwill and fraternity, her assurance of mutual co-operation and sympathy in the endeavour of Western scholars and inquirers to understand Truth in its altruistic aspects. She sends her heart-felt greetings to the trans-atlantic brethren who have taken vigorous measures to understand the mystic or supernormal stages of Buddhist Dhyana.

May all living beings be happy !

আর্য্যজাতি ও আর্য্যধর্ম্ম।

(৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(৩)

ব্যাকরণের সূত্রপাত।

যেমন স্মৃতির উপর দণ্ডায়মান হইয়া: গৃহ্যসূত্র ব্রাহ্মণ হইতে স্বতন্ত্র ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ব্রাহ্মণের সঙ্গে উহার অল্পই যোগ দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি দেখিবে ভাষাবিষয়ক সূত্রসকলও স্বতন্ত্র পত্তনের উপর দণ্ডায়মান। যজ্ঞের মন্ত্র ও গানের যেটুকু সম্বন্ধ তাহাই ব্রাহ্মণে আছে। ব্যাকরণের সূত্রসকল মূলে ব্রাহ্মণের উপরেই নির্ভর করে বটে কিন্তু তারপরে উহা স্বতন্ত্র প্রণালীতে চলিয়া আসিয়াছে। প্রথমে অবশ্য যাগযজ্ঞের সঙ্গে দেবতাদিগকে কিরূপে আহ্বান করিতে হয়, কখন্ কি করিতে হয় তাহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহার পরে ঐ সকল প্রার্থনাসূচক কৃতজ্ঞতাসূচক মন্ত্র যাহাতে বিশুদ্ধ থাকে, যাহাতে অন্য কিছু না উহার সঙ্গে মিশ্রিত হয়, তাহার উপায় বিহিত হইতে লাগিল। সেইজন্য প্রথমে ছড়ান ঋক্‌গুলা সংহিত করিবার আবশ্যক হইল। দ্বিতীয়তঃ, ঐ সকলের বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও পাঠ ঠিক করিতে হইল। এবং তৃতীয়তঃ সেই সকল কাহার দ্বারা রচিত, কি উপলক্ষে রচিত, তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু প্রবাদ সব গ্রন্থবদ্ধ হইল। প্রথম এই সকল রক্ষা করিবার প্রতিই দৃষ্টি গিয়াছিল। পরে অনেক দিন অতীত হইলে যখন বৈদিক ভাষা মৃতপ্রায় হইয়া সংস্কৃত ভাষা বিকাশোন্মুখ হইতে লাগিল, তখন ক্রমে বেদের অর্থ বোধগম্য হওয়া দুরূহ হইতে লাগিল—যত শীঘ্র সাধারণের হইয়াছিল, ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য তাহার অনেক পরে হইয়াছিল—তখনি উহার অর্থকে নিরাপদ এবং দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিবার চেষ্টা পড়িয়া গেল। এই জন্য যাঁহারা ঐ সকল বিষয়ে দক্ষ, তাঁহারা সব শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন—কেবল যে অর্থ বিষয়ে, তাহা নয়; উপাসনা, যাগযজ্ঞের প্রণালী, বেদের অর্থ, তাৎপর্য্য ও দর্শন এ সকল বিষয়েই আলোচনা চলিতে লাগিল। মেয়েরা পর্য্যন্ত এই আলোচনায় যোগ দিলেন। ব্রাহ্মণেরা যে অন্য জাতির নিকটে সম্মানের পদ রক্ষা করিতে পারিলেন তাহার কারণও ইহাই। যত যেখানকার উচ্চভাবের গ্রন্থ দেখিতে পাইবে সবই ব্রাহ্মণদিগের রচিত; কাযে কাযেই কৃতজ্ঞতা ভক্তি সেই শ্রেণীর উপরে গেল। অন্য সকলে বিষয় মত্ত, তাঁহারাই কেবল পরমাত্মচিন্তনে রত। ক্ষত্রিয় রাজারাও এই সকল অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ সহায় হইয়াছিলেন। মন যতদূর উচ্চে উঠিতে পারে ব্রাহ্মণেরা তত উচ্চে উঠিতে ত্রুটি করেন নাই। স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত উৎসাহে পূর্ণ হইয়া যে সকল প্রশ্ন ও মত ব্যক্ত করিয়া আপনাদিগের মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে পুরুষেরা পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল; তাহার মধ্যে গার্গীর কথা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ।

এই আলোচনার স্রোতের সময় ভাষাবিষয়ক গবেষণাও বিশেষ উন্নতিসোপানে আরূঢ় হইয়াছিল। বেদের যত শাখা হইয়া পড়িয়াছিল সকল শাখাগুলিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থবদ্ধ করা হইল। আর তাহাদের পাঠনা-প্রণালী এমনি বিধিবদ্ধ করিয়া দিল, যে, তাহার আর নড়চড় হইবার যো নাই। এক এক বেদের এক এক প্রতিশাখ্য করা হইল, :তাহাতে সেই সেই বেদের যত রকম শাখা হইয়াছিল সব ধরা হইল। তাহাতে শব্দের উচ্চারণভেদ, উদাত্ত অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বরভেদ, সন্ধি ইত্যাদি বিষয়সকল বিশেষরূপে বর্ণিত আছে; গুরুর নিকট ছাত্রের শিক্ষার সময়ে যেরূপে রকম রকম করিয়া

পড়িতে হয় তাহাও বর্ণিত আছে। কি যত্নের সহিত যে তাহারা বেদকে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা ইহার দ্বারা বেশ টের পাওয়া যায়।

বৈদিক ছন্দ ও দেবতা।

বেদের ছন্দপ্রণালী জানিবার জন্যও সূত্রে তাহার বিবরণ রহিয়াছে; তাহার নাম নিদানসূত্র। ঋগ্বেদের আধুনিক ঋকের ভিতরেও কতক কতক ছন্দের নাম আছে। আর প্রতি বেদের অনুক্রমণী আছে, তাহাতে প্রতি সূক্তের রচয়িতা ঋষির, ছন্দের ও উদ্দেশ্য দেবতার নাম বর্ণিত আছে। অনুক্রমণী বোধ হয় সূত্রের পরে রচিত হইয়াছিল—এমন কোন সময়, যখন প্রতি সংহিতার মূল এখন যেরূপ দেখিতে পাই সেইরূপ ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং অভ্যাসের সুগমার্থে বড় বড় এবং ছোট ছোট বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। ক্ষুদ্রতম ভাগ শিষ্যদিগের এক একবারের পাঠ হইত।

বৈদিক প্রবাদ ও গাথা ইতিহাসপুরাণের মূল।

সূক্তরচয়িতাদিগের সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল কেহ কেহ সেই সকল প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ করিলেন; যেমন শৌনকের বৃহদ্দেবতা। ইহা ঋকসংহিতাকে মূল অবলম্বন করিয়া, কেবল দেবতাকে উপলক্ষ করিয়া কোন্ ঋক্ প্রচারিত হইয়াছে এবং সেই ঋক্ সম্বন্ধে যত রকম প্রবাদ আছে, তাহাই সব বর্ণন করিয়াছে। অবশ্য এই সকল প্রবাদের যেগুলা খুব পুরাণো প্রবাদ তাহা ব্রাহ্মণেতেই আছে; যেমন শুনঃশেফ ঋষির প্রবাদ। বিশেষ বিশেষ পূজাপ্রণালীর প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের প্রবাদসকলও ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। এই সকল বিষয়ে ব্রাহ্মণ অনেক সময়ে গাথার উপর নির্দ্দেশ করে, যাহা ইতর লোকদিগের মধ্যে শ্রুতিপরম্পরায় প্রচলিত ছিল। এই সকল গাথা বোধ হয় ইতিহাসপুরাণের মূল। মহাভারতের মধ্যে দুটী একটী গাথা দেখিতে পাওয়া যায়। শৌনকের বৃহদ্দেবতা যাস্কের নিরুক্তির উপরেই সম্যক অধিষ্ঠিত।

নিঘণ্টু।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে দেবগণের স্তোত্র প্রভৃতির অর্থনির্ণয়ে তখন প্রবৃত্তি হইল, যখন বেদের অর্থ দুরূহ হইয়া পড়িল। ইতর সাধারণের নিকট যত শীঘ্র দুরূহ হইয়াছিল ব্রাহ্মণদিগের নিকট কিছু তত শীঘ্র হয় নাই। যাহা হউক বৈদিক ভাষা তখন অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। অতএব সেই দুরবগম্য স্তোত্রসকল বোধগম্য করিবার জন্য প্রথম উপায় হইল; বেদের যত একার্থবাচক শব্দ তাহাদিগকে সংগ্রহ করা, আর যে শব্দ একেবারে অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে তাহাদের অর্থ স্বতন্ত্ররূপে উপদেশ দেওয়া। এইরূপ অভিধানের নাম দিল নিঘণ্টু, অর্থাৎ যত শব্দ আছে সবটা নির্ঘণ্ট করিয়া দিল—সবটা তন্ন তন্ন করিয়া বাহির করিয়া দিল। কোন কোন পণ্ডিত বলেন সবটা নিঃশেষে গাঁথিয়া দিল, এই জন্য 'নিগ্রন্থ'র অপভ্রংশ 'নিঘণ্টু' হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালায় আমাদিগের নির্ঘণ্ট কথা প্রচলিত আছে। নিঘণ্ট রচয়িতাকে নৈঘণ্টুক বলে। বেদের নিঘণ্টু পঞ্চাধ্যায়ী পুস্তক। ইহার প্রথম তিন অধ্যায়ে সমনামশব্দ, চতুর্থ অধ্যায়ে বিশেষ দুরূহ বৈদিক শব্দ এবং পঞ্চম অধ্যায়ে ইন্দ্র মিত্র বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবগণের পর্য্যায় নির্দ্দেশ আছে।

নিরুক্তি।

এই নিঘণ্টুকে সহজ করিবার জন্য, প্রকাশ করিবার জন্য, আবার যাস্ক উহার নিরুক্তি প্রকাশ করিলেন। নিরুক্তি কিনা খুলে বলা—যাহা কিছু বলিবার আছে স্পষ্ট করিয়া ভাঙ্গিয়া বলা। ইহা প্রথমে দ্বাদশ-অধ্যায় ছিল, পরে আর দুই অধ্যায় উহাতে যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বেদাঙ্গ।

এই নিরুক্তকে বেদাঙ্গের মধ্যে ধরা হয়। বেদাঙ্গ হইতেছে ছয়টা—"শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি"। শিক্ষা হইতেছে বৈদিক সন্ধির নিয়মাদি, কল্প হইতেছে ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যবস্থা, ব্যাকরণ হইতেছে বাক্যের উৎপত্তি ও নিয়মকে তন্ন তন্ন করিয়া ব্যাকরণ করিয়া ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা, ছন্দ হইতেছে বৈদিক পদ্যের নিয়ম স্থির করা, নিরুক্ত হইতেছে বৈদিক শব্দের বিবরণাদি, জ্যোতিষ বৈদিক ক্রিয়ার কাল নিরূপণ করার ব্যবস্থা। এই ষড়ঙ্গ না জানিলে বেদজ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গতা সম্পন্ন হয় না। নিরুক্ত, শিক্ষা, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই শ্রেণীর গ্রন্থমধ্যে বৈদিক সময়ের এক একটী করিয়া চারিটী গ্রন্থ পাওয়া যায়, আর সকল গ্রন্থ লোপ হইয়া গিয়াছে। এই জন্য এই চারিটী বিশেষ গ্রন্থকেই আধুনিকেরা বেদের চারি অঙ্গ বলে। পূর্ব্বে ঐ ঐ শ্রেণীর পুস্তক সকলকে বেদাঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিত; যেমন ব্যাকরণ। পাণিনির ব্যাকরণকেই যে ব্যাকরণ বলে তাহা নয়, ঐ শ্রেণীর পুস্তকমাত্রকেই ব্যাকরণ বলে।

ব্যাকরণের উৎপত্তি।

যাস্কের নিরুক্তিতে আমরা ব্যাকরণের সাধারণ আভাস পাই। প্রতিশাখ্যেতে বেদসংহিতার প্রত্যেক সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছে, তাহা হইতে ক্রমে সন্ধির সাধারণ নিয়ম উঠিল—তাহা হইতে ক্রমে আবার ভাষার অন্য অন্য অঙ্গে দৃষ্টি গেল।—যেমন বিভক্তি